তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

ছবি বসুর আত্মজীবনী : 'ফিরে দেখা'

ছবি বসু ব্যক্তি জীবনে সমাজবদলের বামপন্থী আয়োজনে এক সময় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে প্রিয়জনদের পীড়াপীড়িতেই ব্রতী হয়েছিলেন আত্মকথনে। আত্মজীবনীর 'লেখিকার কথা' অংশে লিখেছেন – *"'ফিরে দেখা' বইটির মতো জীবনের অলিগলির নানা খবর অনেক মানুষের ঝুলিতেই রয়েছে, কেউ লেখেন, কেউ লেখেন না। রাজনীতি কিংবা সমাজ নীতির মাপকাঠিতে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েকজনের পীড়াপীড়িতে কাগজ-কলমে জীবনের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরছি।'"*[১] ছবি বসু দীর্ঘ জীবন পথ পাড়ি দিয়ে এসে পেছন ফিরে তাকিয়ে কাগজে-কলমে জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে কেবল নিজের কথা নয়, দাখিল করতে চেয়েছেন জীবনপথের অলিগলির বিবরণ।

ছবি বসুর রাজনৈতিক কর্মী পরিচয়ের বাইরে আরও পরিচয় রয়েছে, একদিকে তিনি যেমন গবেষিকা তেমনি কথাশিল্পীও বটে। গবেষিকা ছবি বসুর প্রথম যৌবনে লেখা বই *'বাংলার নারী আন্দোলন'* (১৯৪৮)। গবেষিকা বলেই হয়তো এখানে তথ্যের, ইতিহাসের নিখুঁত গ্রন্থনার চেষ্টা করেন ছবি বসু। কোন বাঙালি নারীর আত্মকথায় এর আগেআমরা হয়তো 'উল্লেখ পঞ্জী'র ব্যবহার হতে দেখিনি। এর পেছনে হয়তবা ছিল ছবি বসুর বিশেষ ব্যক্তি সচেতনতাই। আবার একজন কথাসাহিত্যিক হিসাবে ছবি বসুর আত্মকথা কথাসাহিত্যিক সুলভ শৈল্পিক গুণ বর্জিত নয়। 'ফিরে দেখা'র মধ্য দিয়ে আমরা বিশ শতকের একজন আত্মজাগ্রত

নারীর দৃষ্টিতেই তাঁর সময়কে -সমাজকে দেখতে পাই। জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ছবি বসু নিজের প্রতি আশ্চর্য নিস্পৃহতা এবং চারপাশের সকল কিছুকে গভীর ভালোবাসা দিয়ে বরণের চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁর স্মৃতিভাষ্য হয়ে উঠেছে এক আশ্চর্য মানবিক দলিল। বিপুল আত্মদানে মণ্ডিত বিপুলতর মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা-সাধনায় সমাজে বামপন্থার প্রভাবশালী হয়ে ওঠার সময়ের কথা বলেছেন ছবি বসু, বলেছেন চরম হঠকারি এক পর্বে দলের ভেতরের অন্যতর চিত্রের কথা, নেতৃত্বের বাইরের বলয়ের তালিম মানা কর্মী বাহিনী তথা নেতৃত্বের হেজিমনিতে পিষ্ট কমিউনিস্ট দলের অভ্যন্তরের নিম্নবর্গীয়দের দুঃখময় সাধনার কথা। এদিক দিয়ে বাংলার বামপন্থী আন্দোলনের স্মৃতিভাষ্যধারায় ছবি বসু সম্পূর্ণ আলাদা এক মাত্রা বয়ে এনেছেন। *'ফিরে দেখা'* বইটির *'মুখবন্ধ'* লিখতে গিয়ে খ্যাতমান বামপন্থী বুদ্ধিজীবী অশোক মিত্র লিখেছেন– *"এই বিংশ শতকীয় উজ্জীবন ঘটেছিল প্রধানত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নায়কত্বে ও প্রেরণায়।"*[২] কিন্তু ছবি বসুর স্মৃতিচারণে নায়কত্বের কোনো প্রমাণ আমরা পাইনা। বরং উজ্জীবিত বাঙালি সমাজ আপন অন্তরের তাগিদ থেকে কী বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে বরণ করেছিল, কতশত অকীর্তিত অস্বীকৃত আত্মদানের মাধ্যমে পার্টির মহিমাকে ঔজ্জ্বল্য জুগিয়েছিল, তার অনন্য পরিচয় দান করেছেন ছবি বসু। বাঙালির উজ্জীবনে বামপন্থার ভূমিকার পার্টিসঙ্গীত নেতারা গাইবেন, বলবেন তত্ত্বের কথা। তবে ছবি বসু পার্টির জয়গান গাওয়া কিংবা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হাজির করার কোনো চেষ্টাই করেননি। তিনি বলতে চেয়েছেন মানুষের কথা, যে অজস্র মানুষ মিশে থাকে সমাজের যে কোনও মহৎ জাগরণের পরতে পরতে; কিন্তু সুখ পাঠ্য ইতিহাসে তাঁদের কেউ কখনো খুঁজে পায় না। আসলে ছবি বসুর রাজনীতিতে প্রবেশও ঘটেছিল নায়ক বর্জিত পরিসর থেকেই। বাড়িতে দাদার কাছে আসতেন জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য, হীরেন মুখার্জীর মত কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্বেরা। কিন্তু তাদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে তরুণী ছবি কখনো ডাক পাননি। লিখেছেন– *"ওঁরা দরজা বন্ধ করে নানা আলোচনা করছেন। আবার*

কেউ কেউ 'ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতও গেয়ে শোনাচ্ছেন। আমি কান পেতে শুনতাম, দাদা কিন্তু কোনওদিনই আমাকে কারও সঙ্ঘে পরিচয় করিয়ে দেয়নি।''[৩] উত্তাল চল্লিশের দশকে ছবি বসু তাঁর রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন– *"আমি এরপর যখন পার্টিতে আসি; সম্পূর্ণ নিজের বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে পার্টির সভ্যপদ পাই। দাদা বা স্বামীর আশ্রয়ে সে বিশ্বাস আমার সেদিন পুষ্ট হয়নি। আমার স্বাধীন মতামত একেবারেই ব্যক্তিগত প্রভাবহীন।''*[৪] ছবি বসুর এই বক্তব্যে যদিও অহমিকার ভাব আভাসিত তথাপি পুরুষতান্ত্রিক পরিসরে এই ভাবনাকে বিশ শতকের প্রথমার্ধের একজন বাঙালি নারীর আত্মানুসন্ধানের প্রচেষ্টা হিসাবেও গ্রহণ করা যায়। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান এর পেছনে নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রেরণার বিপরীতে আটপৌরে সাধারণ অখ্যাত মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনাই সেদিন তরুণী ছবি বসুকে প্রাণিত করেছিল। লিখেছেন বিমল চৌধুরীর মত আত্মত্যাগী মানুষের কথা যাকে তিনি দেখেছিলেন ১৯৪৬ সালের সারা ভারত ডাক-তার ধর্মঘটীদের মহামিছিলের সম্মুখভাগে লালঝান্ডা হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতে। ছবি বসুর কথায়– ''কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে দ্বিধাহীনভাবে প্রত্যয়নিষ্ঠ হলাম ১৯৪৬ সালে সারা ভারত ডাক-তার ধর্মঘটীদের ধর্মঘট এবং তাদের মহামিছিল দেখে। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন রাসবিহারী এ্যাভিনিউ দিয়ে শহীদ মিনারের দিকে মিছিল চলেছে। তার পুরোভাগে লাল ঝান্ডা হাতে নিয়ে দৃপ্ত পায়ে চলেছেন অতি সাধারণ একটি মানুষ, বিমল চৌধুরী। ইনি আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। পার্টির প্রতি সমর্পিত প্রাণ এই মানুষটিকে দিনে দিনে চিনেছি এক নতুন আলোকে। খুব কম দিনই পারিবারিক সূত্রে এর সঙ্গে পরিচয়। বিমলমামাকে কাছে পেয়ে যেন আমার এতদিনের সব দ্বন্দ্বের অবসান হল। ... তিনি পরবর্তীকালে ডাক-তার কর্মচারী বিভাগ থেকে এই ধর্মঘট হেতু ছাঁটাই হয়েছিলেন। চেহারায় কিছু অসাধারণত্বের ছাপ নেই। বিশাল আয়তন লংক্লথের হাফশার্ট আর ধুতি পরনে।"[৫] পার্টিতে প্রবেশের প্রাক্কালে ছবি বসু প্রতিভাবিত হয়েছিলেন সুধা রায়ের মত ব্যক্তিত্বের

দ্বারাও লিখেছেন– ''উনি পাড়ায় কমলা গার্লস স্কুলে চাকরি করতেন। তাঁকে দেখেই বুঝলাম একটা ত্যাগ ও নিষ্ঠার দীপ্তি তাঁর মুখ ছড়িয়ে আছে। এ বহ্নিশিখা চাপা থাকবার নয়। একদিন তাঁর সঙ্গে গল্প করতে বাড়িতে ডাকলাম। আমার কেমন ধারনা ছিল এই মহিলা। নিশ্চয়ই কমিউনিস্টপার্টিতে রয়েছেন। ওর কাছে প্রথমেই আমার মানসিক সঙ্কটের কথা ব্যক্ত করলাম। উনি বল্লেন– উনি নাকি বলশেভিক পার্টিতে কাজ করেন। তবে তার আগে লেবারপার্টিতে কাজ করতেন। লেবারপার্টি থেকে পরবর্তী কালে অনেকেই কমিউনিস্টপার্টিতে এসেছেন। শুনলাম কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা সংগঠনের নাম 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। তিনি এদের সঙ্গে কিছু আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।''[৬]

ছবি বসুর কথকতার রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটি বুঝে নেয়ার স্বার্থে আলোচনার অবতরণিকা দীর্ঘ হয়ে গেল। তবে ছবি বসু জীবনের হয়ে ওঠার এক অন্তরঙ্গ আখ্যানই আমাদের সকলের জন্য তুলে ধরেছেন। ছবি বসু আত্মকথা লিখতে গিয়ে বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের সূচনার দিনগুলির আনুপুঙ্খ পরিচয় দিয়েছেন। পরের দিককার চিত্রসমূহ ধারাবাহিক নয় অনেকটা ছাড়া ছাড়া। যে চড়াসুরে বাধা ছিল প্রথম যৌবনের বিপ্লব কামনা, তাতে চির ধরেছিল। অবশ্য মানবিক সাধনা তাঁর অব্যাহত রইল, তবে এর ক্ষেত্র সমাজ আন্দোলনের নিত্যকার ঘটনাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত না থেকে চলে এলো অনেকটা আড়ালে, সদর পথের বাইরে। তাই বলার কথাগুলো এখানে আর ঘটনাকে অবলম্বন করে নি, সময়ের বিচারে ধারানুক্রমিক থাকেনি, হয়ে উঠেছে টুকরো টুকরো। সেই টুকরো অনেকক্ষেত্রে একেবারেই যেন ছোট গল্প এবং অসাধারণ সেইসব গল্প, যেমন দেখতে পাই একাদশ অধ্যায়ে, রফিক আর মকবুলকে নিয়ে তাঁর খানাকুল গ্রামে যাওয়ার কাহিনীতে।[৭]

জীবন সায়াহ্নে এসে ছবি বসু যখন আত্মকথা লিখতে বসলেন তখন খবরের কাগজের একটি রিপোর্টের সূত্রে তার শৈশবটা তাঁর কাছে ধরা দিয়ে

যায়। এ যেন মনস্তত্ত্বের অদ্ভূত গ্রন্থনা। ২০০০ সালের রিপোর্টটি ছিল বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে, আর তাতেই ছবির অন্তরে শৈশবের স্মৃতি ভেসে আসে। লেখিকার কথায়– *"২০০০ সালের, খবরের কাগজের কয়েকটি লাইনের ওপর চোখ পড়ল। এরকম খবর হামেশাই চোখে পড়ে, মনে তো কই দাগ কাটে না? মনে হল কী মর্মান্তিক! আমিও তো এর শরিক! তাই বুঝি জন্মান্তর ঘটল।*

রিপোর্টে দেখি, এক প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড় বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে সাগরের কিছু দ্বীপের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতি ও নিহত ও নিহত মানুষের সংখ্যা এখনও জানা সম্ভবপর নয়।'

মুহূর্তে আজকের এই আমি, আমার সমস্ত আত্মকেন্দ্রিকতা, নিষ্ক্রিয়তা ঝেড়ে ফেলে বহু বছরের সীমা ডিঙ্গিয়ে শৈশবের আমিতে প্রত্যাবর্তন করি।'"[৮]

ছবি বসুর পিতা রায়বাহাদুর ভবেশ চন্দ্র রায় ছিলেন মহকুমার হাকিম সেই সূত্রে ছবির শৈশবটা কাটে অবিভক্ত বাংলার এক একটি প্রান্তে। ছবি বসুর স্মৃতিতে জায়গা করে নেয় বাংলার গ্রাম শহরের এক একটি ছবি। প্রথমেই পাই বরিশাল জেলার পটুয়াখালি ভোলা মহকুমার চিত্র। পদ্মা, ধলেশ্বরী, মেঘনা, তেঁলিয়া, কালাবদর একাধিক নদীতে ঘেরা ভোলা মহকুমার অনবদ্য ছবি একেছেন ছবি বসু– *"চারিদিকে থৈ থৈ জল আর জল। জ্ঞান হতে ভাবি আমি বুঝি এক জলকন্যা সারাদিন রাত হওয়ায় ঝড়ে নারকেল, তাল আর ঝাউয়ের দোলায় সে দেশ দুলছে। একটু বড় হতে শুনেছি পৃথিবীর তিন ভাগ জল, আর একভাগ স্থল। পদ্মা, ধলেশ্বরী, মেঘনা তেঁতুলিয়া, কালাবদর থেকে থেকেই ফুঁসছে। আবার কোথাও চোখে পড়ে শীর্ণ স্রোতস্বিনী, ঠিক যেন লাজুক এক কিশোরী কন্যা, কুণ্ঠাভরে চলেছে। এক একটি পটভূমিতে যেন বিস্মৃত আকাশ। আচমকা থেকে থেকেই হাতছানি দেয়। স্মৃতিতে জেগে থাকে সাগরের শনশন হওয়া, ঘন নীল আকাশ আর সবুজের বর্ণচ্ছটা। আহা, এখানেই বুঝি আদম ও ঈভের আভাস। তাদের ঘর গেরস্থালী, ক্ষেত-খামার আর সুখের আশ্বাস।'"*[৯] ভোলা মহকুমার

প্রকৃতির এই অনবদ্য চিত্র অঙ্কনে কথা সাহিত্যিক ছবি বসুর জাগ্রত মন যেন কাজ করেছে। ছবি বসু শৈশব জীবনের স্মৃতিতে প্রকৃতির এমন আরো অনেক চিত্র এঁকেছেন। প্রকৃতির সান্নিধ্যেই তাঁর বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর শৈশবটা মা-বাবার স্নেহবর্জিত নয়। মায়ের কাছে দুপুর হলেই গল্প শোনার আবদার ছিল লিখেছেন– *"দুপুরবেলা কাজ সেরে নিজে ভাত খেয়ে মুখে পান নিয়ে মা তাঁর রাঙা টুকটুকে ঠোঁটে একগাল ভর্তি হাসি নিয়ে যখন খাটে শুতে আসতেন, আমরা ছোটরা তখন হামলে পড়তাম। 'গল্‌প চাই গ...ল্‌...প...,' কেউ বলে রূপকথা, কেউ আরব দেশের গল্প, আবার কেউ ধ্রুব, নয় প্রহ্লাদ।"*[১০] আর পিতা ভবেশচন্দ্র রায় কেও দেখা যায় ছেলে-মেয়েদের জীবনযাপনে মুক্ত পরিসরের সংযোজন করতে। কখনো তিনি ইনসপেকশনে ঘুরবার সময় ছেলে-মেয়েদের হাতির পিঠে চাপিয়েছেন।[১১] কখনো বা সুযোগ করে দিয়েছেন নৌকা বিহারের।[১২] পরিবারে ছেলে-মেয়ে বিভেদের চিত্র ছবি বসু আঁকেন নি। পরিবারে যে শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নত পরিবেশ ছিল তাও চোখে পড়ে আর সেখানেও ছেলে মেয়ের বিভেদ হয়নি। ছবি বসু তার শৈশব স্মৃতিতে স্মরণ করেছেন ভোলা মহকুমায় থাকাকালীন কোলকাতায় পাঠরত তার বড় দিদির পুজোর ছুটিতে বাড়িতে আগমণ উপলক্ষে বাড়ির উৎসব মেজাজের কথা। ছবি বসুর কথায়– *"সেদিন বাড়িতে যেন উৎসবের ঘটা। দরজার মুখে লাল শালুতে লেখা 'স্বাগতম্'। আমরা ছোটরা মহা উৎসাহে লাল-নীল কাগজের শিকল বানাচ্ছি। আর সাজানো হবে না-ই বা কেন? বড়দি পুজোর ছুটিতে বাড়িতে আসছে কলেজ থেকে। সাত সমুদ্দুর না হলেও কত নদী-নালা পেরিয়ে রেলগাড়ি, স্টীমার, নৌকা চেপে বাড়ি আসছে। ... বড়দি পড়ে বেথুন কলেজে, থাকে হোস্টেলে, তাই শুধু বাংলায় নয়, বাইরের গেটে ইংরেজি গোটা গোটা অক্ষরে আবার লেখা হয়েছে 'ওয়েলকাম'। কাকে যেন বলি, 'ওটা কী লেখা?' পড়তে জানি না। মুখ্য বল্লে তার মানেও বুঝি না। সে বয়সে বোঝবার কথাও নয়।"*[১৩] ছবি বসুর পারিবারিক এই স্মৃতিচারণা থেকে

অনুমান করা যায় বিশ শতকের কুড়ির দশক থেকে বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার, রায় পরিবারে মেয়েদের বাদ দিয়েও বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যেও মেয়েদের শিক্ষার প্রতি সচেতনতা অনেকটাই যেন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯২৬-২৭ সালের ভোলার চিত্রে আমরা দেখতে পাই ছবি বসু গৃহ কোণের অনেক ছবি এঁকেছেন, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে শিউলি গাছের ফুল তোলা আবার সেই ফুলের বোঁটা দিয়ে রং তৈরী করে সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে জামা রাঙানো। আর এই গৃহকোণের স্মৃতির মাঝেই হানা দেয় সমাজের অভিঘাত, মাঝ দুপুরে কাপড়ের গাটরি নামিয়ে হাঁক দেয় খদ্দরদাদা 'কৈ গো, মা জননী কোথায়?'[১৪] গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খদ্দরদাদার সহজ সম্পর্ক চিত্র ফুটে ওঠে– *"মাও চেঁচাতেন, যাই বাছা। ওরে আসছি। ওরে মেয়েরা, তোরা কোথায় রয়েছিস? হাতপাখা নিয়ে দাদাটাকে একটু হাওয়া কর। আহা গো, এই ঠাঠা রোদ্দুরে কাকপক্ষী অবধি বেরোয় না, মানুষ তো কোনছার!' ছোট ছোট পায়ে আমাদের হুড়ো হুড়ি পড়ে যেত।*

'খদ্দরদাদা, আমার বাঁশী?'

'আর আমার লবঞ্চুস?'

মা বকতেন। তাঁর হাতে তখন রেকাবীতে নারকেল নাড়ু আর বাতাসা, সঙ্গে এক ঘটি ঠান্ডা জল। নিজে হাতে তিনি পাখা করবেন।'"[১৫] এই ছবিগুলি যেন বঙ্গীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বহন করে। মানুষের মানবিক সম্পর্কের জয়গান গায়। খদ্দরদাদাকে ঘটির ঠাণ্ডা জল, নারকেলনাড়ু, বাতাসা খাইয়ে গৃহকর্ত্রী তার কাছে আবদার করেন গান শোনার। খদ্দরদাদা গান গাইলেন–

"খদ্দর বেচিতে এলে মানুষ পেলাম না।
যাই যতসব বাবুদের কাছে,
সিল্ক সাটিন বিলিতি আছে?

মোটা খদ্দর পরে নামলে জলে
ওঠা যায় না
শুনে হাসি ধরে না।''[১৬]

খদ্দরদাদা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে এবং তার গানে আমরা সমাজ ইতিহাসকেই খুঁজে পাই। বিশ শতকের বিশের দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাব ঘটে গেছে। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে 'অসহযোগ' আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। দেশীয় শিল্প বিকাশে 'অসহযোগ' আন্দোলনের কর্মপন্থা হিসাবে গৃহীত হয়েছিল 'চরকা কাটা' 'তাঁত শিল্প', 'খাঁদি শিল্প' স্থাপনের কর্মসূচি।

বিদেশী বস্ত্রের জায়গায় দেশীয় বস্ত্রের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে আসীন হলেও দেশের মানুষ সেদিন এগিয়ে এসেছিল। ছবি বসুর স্মৃতি কথায় খদ্দর দাদা চরিত্রটি গান্ধীজির ডাকা 'অসহযোগ' আন্দোলনের আবেগে স্নাত দেশীয় মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। আবার আন্দোলনের ব্যাপকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। ছবি বসুর স্মৃতিচারণে ভোলার স্মৃতি সমাজ অভিঘাতের পরিচয় বহন করে কোন একদিন দিদির সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে ছিলেন দিদির পাঠশালা দেখতে আর রাস্তায় বেধেঁছিল দাঙ্গা। মসজিদের সামনে হিন্দুদের খোল করতাল বাজিয়ে সংকীর্তন গাওয়াতে দাঙ্গা বেঁধেছিল। কোন ক্রমে দুই বোনের দাঙ্গার কবল থেকে দৌঁড়ে পালানো, এদিকে মা বাড়ির সদর দরজায় আকূল হয়ে মাথা কুটছেন। দাঙ্গা থামাতে গেছেন ছবি বসুর বাবা। লিখেছেন– *"শুনলাম বাবা দু'পক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলেন। বল্লেন,-- 'Music before mosque' চলবে না।''*[১৭] স্মৃতির এই প্রসঙ্গগুলি সমাজ ইতিহাসের দলিলে পরিণত হয়েছে।

ভোলার পর নওগাঁ, রানাঘাট, দিনাজপুর মুন্সিগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি। গৃহকর্তার বদলির চাকরির সুবাদে ঘুরেছে পরিবারটিও, আর বালিকার মন গেঁথে

তুলেছে কতো না ছবি। নওগাঁতে গানে হাতেখড়ি হয় চিত্ত সেনের কল্যাণে। তুলির সামান্য আঁচড়ে চিত্ত সেনের অবিস্মরণীয় ছবি তিনি ফুটিয়ে তোলেন, লেখেন– *"চিত্ত সেনের কথা একদিন যাঁরা সে সময় নওগাঁতে থেকেছেন, কেউ ভুলতে পারবেন না। আমাদের কাছে নওগাঁ মানে চিত্তদা, চিত্তদা মানে নওগাঁ। রাজশাহী জেলার একটি মহকুমা নওগাঁ। রবীন্দ্রনাথ তখন গানের পর গানরচনা করেছেন। কিছু কিছু গীতিনাট্যও অভিনীত হচ্ছে। কিন্তু মফঃস্বলের মানুষের কাছে রবীন্দ্র সহগীত তখনও তেমন সমাদর পায়নি। সেই সুদূর মফঃস্বলী শহরে, সান্তাহার জংশন স্টেশনের অদূরে এই ছোট্ট নতুন গড়া শহরে বসে চিত্ত সেন ঠিক যেন একলব্যের সাধনায় স্বরলিপি সংগ্রহ করে অজস্র রবীন্দ্র সংগীত নিজের গলায় তুলেচেন, বহু ছেলে-মেয়েকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিয়েছেন। চিত্তদাকে দেখেছি কত ছেলেবয়সে। এখনও তাঁর টানা টানা ভাবুক চোখ, খদ্দর পরা চেহারাটি মনের এক জায়গায় বাঁধা পড়ে রয়েছে। সেদিন কত গান আর কবিতা শুনেছি তাঁর কাছে বসে।''* [১৮]

আরেক দিনের কথা তিনি লিখেছেন – ''জ্যোৎস্নারাত, আমাদের ফুলবাগান পেরিয়ে লিচুগাছের পাতার ঝালর ডিঙ্গিয়ে চাঁদের আলোয় রাত যেন দিন হয়ে যেত। নদীর জলে কখনও-সখনও দুটি একটি ডিঙা বেয়ে চলেছে। হঠাৎ সেখান থেকে গান ভেসে আসত। তিনটি গলা এক হয়ে গাইছে– 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে...।' কে গাইছে? বাবা বল্লেন, 'চিত্ত, রবি আর শান্তি।' চিত্তদা আর রবি কাকা, শান্তি কাকা। ওরা সুভাষদার (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) কাকা। গানটা *সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনি। ঠিকই কানে যায়। বাবা-মাও গুণগুণ করছেন, 'সবাই গেছে বনে'।''* [১৯] লেখিকা আরো জানান, চিত্ত সেন তরুণ বয়সেই যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। লেখিকা দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন– *"চিত্তদার মতো আদর্শবাদী যুবক সে যুগেই হয়তো সারা বাংলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই নিরাসক্ত, আত্মভোলা তরুণ বাঙালী*

চিত্ত সেনের পরিচয় আজকের এই সংস্কৃতির নামে বাণিজ্যিক জগতে ক'জনই বা জানে।'' [২০]

ছবি বসুর স্কুল জীবনের সূচনা ঘটে রানাঘাটে থাকাকালীন। রানাঘাটের লাল গোপাল হাইস্কুলে তিন ক্লাস না পড়ে আট বছর বয়সে একেবারে ক্লাস ফোরে ভর্তি হন। লাল গোপাল হাইস্কুল ছিল ছেলেদের স্কুল কিন্তু ছবি বসুর পিতা ঊর্দ্ধতন শিক্ষা বিভাগে চিঠিপত্র লিখে ছেলেদের স্কুলেই মেয়েদের পড়াবার সম্মতি আদায় করেছিলেন। ছেলেদের স্কুলে মেয়েদের পড়াবার সুযোগ তৈরী হলেও ছবি বসু স্কুলে পড়ার স্মৃতিতে 'ছেলে-মেয়ে' একসাথে পড়া নিয়ে সমাজ মানসিকতার আঢ়ষ্ঠতারই চিত্র তুলে ধরেছেন। স্কুলে পড়ার স্মৃতিতে লিখেছেন—

"সে বয়স থেকেই লিঙ্গ বিভাজনের সম্মুখীন হয়েছি।

বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে ইস্টিশনের কাছে স্কুল। বই-খাতা নিয়ে সটান চলে আসতাম ক্লাস নয়, টিচার্স রুমে। পরপর ছয়টি পিরিয়ডের এক একটি মাস্টারমশাইয়ের চেয়ারের পাশেই আমার নির্দিষ্ট চেয়ার। ভুলেও ছেলেদের দিকে ফিরে চাইতাম না। কিন্তু এর জন্য তাড়না কি কম সহ্য করতে হয়েছে। পঞ্চাশজন ছেলে একদিকে, আর একটি ভীতু মেয়ে আর একদিকে। ব্ল্যাকবোর্ডে মাস্টারমশাই আমাকে কিছু লিখতে বলে অন্যদের পড়াচ্ছেন। সন্ধিবিচ্ছেদ লিখছি। ফুড়ুৎ করে একজন কোন ফাঁকে এসে লেখাটার একটি অক্ষর মুছে দিল। সমস্তটা ভুল হয়ে গেল। আমার চেয়ারে কে-বা থুথু ফেলে রাখল। সারাদিন হয়ত ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে টেবিলে লিখছি। জনতা বেশ আনন্দ উপভোগ করে। জানতাম নালিশ করলে স্কুলে পড়া আর হবে না। অথচ এইসব ছেলেদের কেউ কেউ বিকেলে আমাদের বাড়ির মাঠে ফুটবল খেলতে এসেছে। ওদের সঙ্গে এক টিমেও আমি খেলেছি। এ নিয়ে বাড়ির কোনদিনই কোন বাধা ছিলনা। কিন্তু স্কুলে ছেলে মেয়ে কথা বলছে, পাশাপাশি বসছে তাহলে তার ইজ্জৎটা কোথায় থাকে।'' [২১]

স্কুলের অল্প বয়সি ছেলেদের স্কুলপড়ুয়া মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক

আচরণ বৃহত্তরভাবে মেয়েদের প্রতি সমাজ মানসিকতাকেই ব্যক্ত করে। লেখিকার স্কুল জীবনের এই অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় বিশ শতকের কুড়ি-তিরিশের দশকে এসেও সমাজ ছেলেদের সহবস্থানে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার কে যেন পুরপুরি মেনে নিতে পারছেন না। লীলা মজুমদারও আত্মজীবনীতে তার শিক্ষা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে সহপাঠী ছেলেদের মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞা সূচক মনভাবের কথাই জানিয়েছিলেন। লীলা মজুমদারের কথায়– *"তখন যেসব মেয়েরা স্বাধীনভাবে বাইরে বিচরণ করত- অর্থাৎ পুরুষ রক্ষাকর্তা ছাড়া কলেজে যেত, সিনেমা দেখতে যাবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবত না — তাদের মধ্যে সবাই না হলে দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ ছিল ব্রাহ্ম মেয়ে। যেসব হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে তাদের দেখাশোনা হত, তাদের ৯০ শতাংশ হিন্দু এবং ৮০ শতাংশ ছেলেদের বাড়ির মেয়েরা অন পুরুষদের সঙ্গে কথা বলত না। এসব ছেলেদের পক্ষে একথা ভাবা অসম্ভব ছিল না যে যেসমস্ত মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পড়াশুনো করে, তাদের পক্ষে ভালো থাকা অসম্ভব। এই মনে করে মেলামেশায়, তাঁরা বাধা দিতেন, কানে সতর্কবানী চালতেন।"* [২২]

দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক চরমতম পর্যায়েই ছবি বসুর বাল্য জীবন কেটে ছিল। ছবি বসুর স্মৃতিচারণে এই কালপর্বটির পরিচয় আমরা পেয়ে যাই। রানাঘাটে থাকার স্মৃতিচারণে এক জায়গায় লিখেছেন– *"স্বদেশী ছেলেদের প্রথম দেখি চোখের ওপর; আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই তারা বিচারালয় থেকে জেলে যেত। বাবা ছিলেন তাদের বিচারক। ওরা সে কথা জানত। আমাদের বাড়িটাও চিনত ওদের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি আমার বুকে বড় বাজত একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা আর হীনম্মন্যতায় ভুগতাম। শিশুকাল থেকে যারা নিজেদের বাবাকে বিদেশী সরকারের হুকুম তামিল করতে দেখেছে তাদের একটা মানসিক জ্বালা ও অপরাধবোধে ভুগতেই হয়। কিছু করবার নেই।"* [২৩] ছবি বসু বলেছেন, রানাঘাটে থাকাকালীনই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠনের ঘটনাটি ঘটে সে সময় এই ঘটনার ঢেউ

পৌঁছে গিয়েছিল সুদূর রানাঘাটেও। লেখিকার কথায়– *"সে কী ভীষণ দিন! সারা শহরে যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে। একটু মনে পড়ছে, ক'দিন বোধ হয় স্কুলও বন্ধ ছিল। অথচ ঘটনাটা ঘটেছে চট্টগ্রামে। ফিস ফিস, গুজ গুজ, চারিদিকে শুধুই ত্রাস। কার ছেলে গ্রেফতার হল, কোন বাড়িতে পুলিশি হানা দিল। বড়রা কাগজ পড়ে কত কিছু বলাবলি করে, আমরা ছোটরা হ্যাঁ করে সে সব ঘটনা শুনি। মাস্টারদা (সূর্যসেন), কল্পনা দত্ত, প্রীতি ওয়াদ্দেদার, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল... আরও কতজনের নাম সবার মুখে মুখে। সারা শহর ইংরেজ টমিতে ভরে গেছে। আসছে রানাঘাট বড় জংশন স্টেশন। এখানে সকালে চট্টগ্রাম মেল এসে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। তাই আসামীরা এধার-ওধার আশ্রয় নিতেই পারে। হন্যে হয়ে ইংরেজের চর তাদের পেছনে ছুটছে। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেদের পেছনে ও টিকটিকি। তরুণ বাঙালী ছেলে ওদের মতে এক একটি বোমা। গাড়ি গাড়ি পুলিশ আসে সদর জেলা কৃষ্ণনগর থেকে। শোনা যাচ্ছে ট্রেজারি লুট হবে। শুধু ছেলেরা কেন, মেয়েরাও কি কম যায় নাকি?*

স্কুলের ছাত্রী শান্তি, সুনীতি (এখনও যাদের গাল টিপলে দুধ ঝরে) ইংরেজ হাকিমকে গুলি করতে ব্যর্থ হয়ে ধরা পড়ে। তারাও কী কম! সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি ভাব। শক্ত হাতে এই টেররিস্টদের পাকড়াতে হবে। ধর, পাকড়ো, তারপর সোজা কালাপানি পার করে দাও। নির্দেশ আসে।'"[২৪] ছবি বসু আরো জানিয়েছেন ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জে তার পিতার পূর্বসূরি কালীপদ মুখুজ্যে কে স্বদেশী ছেলেরা কিভাবে হত্যার পরিকল্পনা করে ব্যর্থ হয়েছিলো।[২৫] কালের গ্রন্থনায় ছবি বসু একটা যুগকেই যেন জীবন করে তুলেছেন।

রানাঘাটে থাকাকালীন ছবি বসুর মেজদির বিয়ে হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহযোগী কংগ্রেসী নেতা সূর্য সোমের ছেলে সঙ্গে। দুই বাড়ির পরিস্থিতি ছিল বিপরীত। বর পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছিল বিয়েতে যাতে কোনরকম বিলিতি যৌতুক না দেওয়া হয়। ছবি বসু লিখেছেন– *"সেই থেকে আমাদের বাড়িতেও*

বিয়েতে পিয়ার্স সোপ সাবানের বদলে মহীশূরের চন্দন সাবান, অগুরু সেন্ট আর (খদ্দর নয়) দেশী শিল্পের জামাকাপড় ট্রেতে সাজানো হল।''[২৬] জীবনযাত্রায় এইরূপ পরিবর্তন সেদিন এসেছিল, দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবেগকে কেন্দ্র করেই। জাতীয় আন্দোলনের এই পর্বটি দেশের আবাল-বৃদ্ধ প্রত্যেককেই যেন আক্রান্ত করেছিল, যেমনটা দেখা যায় বালিকা ছবি বসুর ক্ষেত্রেও। বাড়িতে বাবা-মার অনুপস্থিতিতে দেশ নায়কের মৃত্যুতে শোকদিবস পালন উপলক্ষে অনশনে বসে পড়েন। লেখিকার কথায়– *"রানাঘাটে বাবা যখন ছিলেন সে সময় একদিন মা ও বাবা বোরবেলা কী একটা পারিবারিক অসুখ শুনে কলকাতা গেছেন। রাতের ট্রেনে ফিরবেন, এই রকম কথা। সময়টা আমার ঠিক মনে নেই তবে সকালবেলা রাঙাগি কাগজে দেখে যে কে একজন সুবিখ্যাত দেশ সেবক, মতিলাল নেহরু (নয়ত চিত্তরঞ্জন দাশ), মারা গেছেন। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় নাকি সেদিন শোক দিবস পালন করা হবে অর্থাৎ সবাই সেদিন অনশন করবেন। রাঙাদি বল্লে, 'আমরাও কেন বাদ যাব। সবাই উপোস করব।' সঙ্গে সঙ্গে দিদিভাই ও আমি রাঙাদির প্রস্তাবে রাজি হলাম।''*[২৭] সেদিন বালিকা ছবি বসু তার রাঙাদি, দিদিভাই এর সঙ্গে অনশন পালন করেছিলেন পর্দা টাঙিয়ে সারা দুপুর নিজেরা বানিয়ে টানকও করেছিলেন, বাড়ি পরিচারক নানার অনেক বোঝানে সত্ত্বেও অনশন ত্যাগ করেন নি। সন্ধ্যায় সমবেত কণ্ঠে গান করেন–

"ছেড়ে গেছে মোদের সবার বন্ধু
ছিঁড়ে ফেলে সব মায়ার টান।''[২৮]

গান করতে করতেই বালিকা ছবি বসু অসুস্থও হয়ে পড়েন। কিন্তু লেখেন– *"এইভাবে জাতীয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করি।''*[২৯] আর আমরা এর মধ্যে খুঁজে পাই দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষা আবেগ ভালোবাসার এক ঐতিহ্যময় পর্বকে।

ছবি বসু তাঁর বাল্য-কৈশোর জীবন পর্বের কথা গিয়ে বলতে অখণ্ড বাংলার একেকটা জনপদের স্মৃতিচারণা করে গেছেন। তাঁর স্মৃতিচারণায় কখনো উঠে এসেছে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ছত্রিশটি গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠা বিক্রমপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা। লিখেছেন – *"বিক্রমপুরের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম বজ্রযোগিনী। প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ শ্রমণ অতীশ দীপঙ্করের এটি জন্মভূমি। বাংলাদেশে, বৌদ্ধ ইতিহাসের এই মানুষটির কথা হয়ত অনেকেই জানে না। কিন্তু সুদূর তিব্বতে সেই প্রথম এক বাঙালী বৌদ্ধ শ্রমণ বুদ্ধের বাণী, পাণ্ডুলিপি নিয়ে বছরের পর বছর গুম্ফায় কাটিয়ে ছিলেন।"*[৩০] আবার কখনো তিনি নদী মাত্রিক বাংলার চিত্র এঁকেছেন। মুন্সিগঞ্জে থাকাকালীন সেখানকার নদী ও জনজীবনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন– *"গোধূলিতে কী যে ভাল লাগত আজানের ডাক শুনতে। দূর-দূরান্ত নদীর জলে আছড়ে পড়ত। আমাদের মুসলমান মাঝিরা যখন নামাজ পড়ত নৌকার চালে বসে, তখন তারাও প্রতিধ্বনি দিত। নদীবহুল বাংলায় এই আজানের ডাক ঠিক গ্রাম্যবধূর শাঁখে ফুঁ দেওয়ার আওয়াজের মতো।"*[৩১] আবার কখনো স্মরণ করেছেন রানাঘাটের বাঙালিদের নববর্ষ উৎযাপনের আনন্দ উৎসবের কথা। *"অনেক রাতে স্টেশনের কাছে খোলা চত্বরে ঘোড়ার গাড়ি ও তার ত্বাথায় চেপে এক একটি পরিবার এসে জমায়েত হতো। আমরাও যেতাম। গরু গাড়ির ওপর সুন্দর করে তৈরী ময়ূরপঙ্খী নৌকার মিছিল একের এক চলত। গরুগুলিকে কী বানাত সে কথা কিন্তু মনে নেই। গাড়ির ওপর সুন্দর ফরাস পাতা। বেশ কয়েকটি নব্যবাবু কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী আর গলায় উড়ানি ঝুলিয়ে, এক হাতে গোলাপ ফুল নিয়ে গলা ছেড়ে গাইছেন আর নাচছেন:*

রানাঘাট সোনার শহর
ও বাবু মহাশয়...
তার সঙ্গে দোহার দিচ্ছে যেন কয়েকজন
তাইতো আইতো তাইতো তাই ...

আতরদান থেকে আতর ছিটচ্ছে। সে কী দারুণ হুজ্জতি!''[৩২] সমাজ ইতিহাসের দলিল হিসাবে এ সকল স্মৃতি অবশ্যই দুর্মূল্য হিসাবে বিবেচিত হবে। লেখিকার বাল্য কৈশোর জীবন পর্বে উন্মুক্তজীবন পরিসর লেখিকার জীবন অভিজ্ঞতায় এরূপ বৈচিত্রতা এনেছিল। আমরা যদি উনিশ শতকের প্রথম দিককার বাঙালি মেয়েদের আত্মকথার দিকে নজর দিই তাহলে দেখব তাঁদের আত্মকথায় গৃহকোণের কথাই বেশি। তুলনামূলকভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালি মেয়েদের আত্মকথায় গৃহকোণের খবরাখবরের সাথে বাইরের পৃথিবীর চালচিত্রের খবরও স্থান পেয়েছে। সরলা দেবী চৌধুরানী (১৯৫৭)-র আত্মকথা, শারদা মঞ্জরী দত্ত (১৯৫৭) আত্মকথাতে এই দিকটি দেখা যায়। আসলে সামাজিক অবরোধের বেড়াজাল এই সময় কালের মেয়েরা কিছুটা হলেও অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। শিক্ষার অধিকার অর্জন করতে পেরেছিলেন। বিশশতকে এসে নারীর প্রতি সমাজের অবরোধের বেড়াজাল আরও কিছুটা হয়তো শিথিল হয়ে পড়েছিল যেখানে ছবি বসুর মত মেয়েরা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

বাল্য-কৈশোর জীবনের বিচ্ছিন্ন স্মৃতির মাঝে ছবি বসু কখন তার ঠাকুমার কথা আমাদের শুনিয়েছেন, *"ঠাকুমা স্বপাকে খেতেন। একটা তোলা উনুনে বাতের সঙ্গে যে নিরামিষ তরকারী খেতেন সেটি সরের ঘিতে রান্না হতো। হলুদ বা তেমন কোন মশলা দিতেন না মনে হয়। আর পেতলের সরায় (যাকে বলা হতো বোগনো) রান্না হতো। কী সুগন্ধ যে ছড়াত কী বলব! আমরা তখন স্কুল থেকে হয়ত ফিরেছি। গন্ধে বাড়ি ম ম করত।*

ঠাকুমা রোজ কিছুটা বাবার জন্য তুলে রাখতেন। কোন দিন ভাই আশিসকে দিতেন। মেয়েদের নয়।'' [৩৩] স্পষ্টতই বোঝা যায় ছবি বসুর ঠাকুমা পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতায় প্রতিভূ। যার জন্য বাড়ির মেয়েদের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল রক্ষণশীল। কিন্তু ছবি বসু লিখেছেন– *"এ জন্য ঠাকুমার ওপর রাগ হতো না। ক্ষোভ তো নয়ই। মেয়ে নয়, ছেলের প্রতি তাঁর বেশী আকর্ষণ সে যুগে তো*

স্বাভাবিক ছিল। হয়ত ভাবতেন, ছেলে যে রকমই হোক, সে পুরুষ। 'সোনার আঙটি কি বাঁকা।'— এমন তো তখনকার মেয়েরাই ভাবতেন!''[৩৪] পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাটামোকে যে অতি স্পষ্টভাবে বিশ শতকের বাঙালি মেয়েরা চিনে নিতে পেরেছিলেন ও যেন তারই উদাহরণ।

রানাঘাটের লালগোপাল হাইস্কুলের পর ছবি বসু পড়াশুনো করেন দিনাজপুরের মেয়েদের হাইস্কুলে, এরপর জলপাইগুড়ির সদর হাইস্কুল থেকে ১৯৩৮ সালে স্কলারশিপ পেয়ে কলকাতায় পড়তে আসেন, প্রথমে ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন ও পরে আশুতোষ কলেজে। লেখিকার কাছে শহর কলকাতা এত দিনকার মফঃস্বলী জীবন ধারণের অভ্যাসে নতুন বৈচিত্র নিয়ে দেখা দিয়েছিল। লিখেছেন– *"তখনও আমার চোখে মফঃস্বলীঘোর লেপটে রয়েছে। এর মাঝে কলকাতা যেন এক চলচ্চিত্র। কী নতুন, কী ঝকঝকে, কী আলো- যেন সার সার রূপের পসরা নিয়ে শহর দাঁড়িয়ে রয়েছে।''*[৩৫] লেখিকার স্মৃতিতে অতীতের সেই কলকাতা কাব্যিক সৌন্দর্য নিয়েই উপস্থিত হয়। তিনি সমকালীন কলকাতার জীবনযাত্রার এককেটা ছবি এঁকেছেন- ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যেত প্রথম ট্রাম চলবার আওয়াজ আর টুং টাং শব্দে, ভোর থাকতেই কর্পোরেশনের লোকেরা হাইড্রেনের মুখে পাইপ ঢুকিয়ে ফ্যাট আওয়াজ করে রাস্তা ধুয়ে যান, শুরু হয় গলিতে গলিতে রিক্সার ঘন্টা, বাড়ির সামনে কচিগলায় রামপ্রসাদী সুরের গান, হিন্দুস্থানী মেয়েদের দুধেল ছাগল ও গোয়ালাদের দুধেল গরু নিয়ে পৌঁছে যাওয়া, শিশি-বোতল-কাগজওয়ালা বিকট আওয়াজে ফেরি করা, মাটি বিক্রেতার 'মাটি লিবে গো' ডাক দিয়ে গলি গলি ঘুরে বেড়ানো, বিকেলে ফুল বিক্রেতার 'চাই বেলফুল, বেলফুল' ডাকে আগমন, ফরাস ভাঙা থেকে একেকটা বনেদি বাড়িতে তাঁতীবাবুর আগমন, কাঁসা পিতলের বাসন নিয়ে বাসনওয়ালার ঝুমঝুম করে কাঁসি বা পেটা ঘন্টা বাজিয়ে পাড়া জমকালো করে তোলা। আরও স্মরণ করেছেন হিং, মেওয়া বিক্রেতা কাবুলিওয়ালার কথা, সাবান-আলতা-চুলের কাঁটা-রেশমি

চুড়ি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফেরিওয়ালার পৌঁছে যাওয়া– অতীতের কলকাতার জনজীবনের নিবিড় চিত্রই আঁকবার চেষ্টা করেছেন ছবি বসু। আসলে একজন আত্মজীবনীকার হিসাবে ছবি বসু ছিলেন সচেতন তাঁর এই সচেতনাই যেন তাঁকে প্রেরিত করে আত্মকথার মধ্য দিয়ে সমাজ ইতিহাসের নিবিড়তম পাঠ পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে।

কলকাতায় এসে ছবি বসুর জীবনে আগমন ঘটেছে একেক জন নতুন মানুষের। বলেছেন সহপাঠী সুকুমারী দত্তের কথা, *"সেন্ট মার্গারেট থেকে আসা মেয়ে, দেখে প্রথমে ভেবেছিলেন বুঝি কোন পণ্ডিত ঘরের মেয়ে, বুদ্ধি দীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা, অথচ বড়ই সাদাসিধে চালচলন। সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে এক নাগাড়ে সংস্কৃতে কথাবার্তা বলে। শুনে মুগ্ধ হই।'*[৩৬] এই সুকুমারীই পরবর্তীকালের খ্যাতমান প্রাচীন ভারত বিশেষজ্ঞ সুকুমারী ভট্টাচার্য। আরেক সহপাঠী রেবা ঘোষ সম্পর্ক লিখেছেন, ''ও পরত খদ্দরের শাড়ি। আর আমি তো খদ্দর দেখলেই গলে যাই।"[৩৭] সহপাঠীর এইরূপ পরিচয়দান কৌতুকবহ হলেও আমাদের কাছে অনেক বড় সামাজিক বোধের পরিচয় ঘটায়। সহপাঠী রেবা ঘোষের যাতায়াত ছিল সরস্বতী প্রেসে। এই প্রেস থেকেই সে সময় 'মন্দির' নামে মেয়েদের প্রগতিশীল পত্রিকা প্রকাশিত হত, সম্পাদক ছিলেন কামলা দাশগুপ্ত। রেবা ঘোষের সঙ্গে সরস্বতী প্রেসে যাতায়াতের সূত্রে ছবি বসুর পরিচয় ঘটে কমলা দাশগুপ্তের সঙ্গে। সে সময় কমলা দাশগুপ্তের কাছে কিশোরী ছবি বসু বিদেশী শাসনের নিষ্পেষনের গল্প, *'যুগান্তর' 'অনুশীলন'* পার্টিকে কেন্দ্র করে স্বদেশী ছেলে-মেয়েদের আত্মত্যাগের গল্পগুলি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। লেখিকার ভাষায়– *"কমলা দাশগুপ্তা আমাকে এদেশে বিদেশী শাসনের নিষ্পেষণের অনেক গল্প করেন। শুনলাম ওদের 'যুগান্তর' পার্টি ছাড়াও 'অনুশীলন' পার্টিতেও বহু স্বদেশী ছেলে মেয়ে রয়েছেন, যাঁরা দেশের জন্য সবরকম ত্যাগ স্বীকারে তৎপর। আমাকে অফ পিরিয়ডে মন্দিরার আফিসে আসতে বল্লেন। ...*

তখন বীনা দাসের কথা জিজ্ঞেস করি। দিদিদের কাছে শুনেছি কনভোকেশনের সময় তিনি ইমরেজ গভর্ণরকে গুলি করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ধরা পড়ে তখন তিনি জেলখানায়।''[৩৮] কামনা দাসগুপ্তের কাছে বিদেশী শাসনের নিষ্পেষণের গল্প, স্বদেশী ছেলেমেয়েদের আত্মত্যাগ এর গল্প শুনে কিশোরী ছবি বসুর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। অভিব্যক্তিতে লেখেন– *"আমার অপরিণত সবাই একে একে হিরোইন হয়ে উঠেছে। ... এদের প্রত্যেকের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ সে সময় আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে।। তখনও রাজনীতির কিছুই জানি না। এ নিয়ে পড়াশুনো বা আলোচনা কারও সঙ্গে করতে পারিনা। মনে মনে ঠিক করে ফেলি সাধারণ জীবনযাত্রা, নিজস্ব কেরিয়ার গড়ে তোলা, কোনটাই আমার পক্ষে সম্ভব নয়।''*[৩৯] সমকালীন যুগের প্রেক্ষিতে বিদেশী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পূর্বসুরি বীণা দাস, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারদের মত মেয়েদের লড়াইয়ের গল্পে কিশোরী ছবি বসুর উৎসাহিত হওয়া, নিজস্ব কেরিয়ার বিসর্জন দিয়ে বিদেশী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হওয়ার কামনা কিন্তু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু এর সঙ্গেও লেখিকা যখন উচ্চারণ করেন– *"জীবনটা কেন বন্ধ হবে? কেন পারিপার্শ্বিক একটা কেন বন্ধ হবে? কেন পারিপার্শ্বিক একটা তেতো জীবনের সঙ্গে আমাকে মানিয়ে চলতে হবে? একটা আদর্শকে ধরে রাখার জন্য ব্যাকুলতা, দুঃসাহসিক পথে পা বাড়ানো আমার পক্ষে কি সম্ভব নয়? কেন নয়?''*[৪০] একজন নারী হিসাবে লেখিকার এই উচ্চারণ কিন্তু তাৎপর্যবহ। দেশের জাতীয় আন্দোলনে সামিল হতে চাওয়া লেখিকার মনে প্রশ্নগুলি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নারীর প্রতি অবরোধের কাঠামোগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধের একজন বাঙালি মেয়ের দেশের জাতীয় আন্দোলনে সামিল হবার বাসনা যেন পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো থেকে মুক্তির লড়াই। ছবি বসু (১৯২৪)র অনুজ অনুরূপা বিশ্বাস (১৯৩২) বিশশতকের প্রথম অর্ধের আরেকজন বাঙালি নারী যখন তেভাগা আন্দোলনে সামিল হয়ে আন্ডার গ্রাউণ্ড

জীবন যাপন করছেন, বিপ্লব মুখর দিনে জোতদারদের জমি দখল করে ধান কাঠার পর্ব চলছে। সে সময় নিজ মনের দ্বান্দ্বিকতার কথা জানাতে গিয়ে লিখছেন— *"যারা ধান কাটছে, মাড়াই দিচ্ছে আবার বিলি করছে তাদের কাজে উৎসাহ দিচ্ছিলাম। কিন্তু বেতরে ছিল চাপা শঙ্কা— এ নিয়ে না রক্তারক্তি কাণ্ড হয়। পার্টির ডাকে বেরিয়ে এসেছি বিপ্লব করতে কিন্তু রক্তপাতে আমার বড় ভয়, খুব অনীহা। কিছুতেই এই শ্রেনি দুর্বলতা কাটাতে পারছিলাম না। আসলে মানুষটা আমি লড়াকু নই বড় বেশি শান্তিপ্রিয় যদিও ভিতু নই। আপন মনে আকাশ পাতাল ভাবতে ভালোবাসতাম, ভালোবাসতাম সপ্রান প্রকৃতিকে, কবিতা লিখতে। লড়তেই ভালো লাগত বেশি। ভাবুক মন কার্যকরণে হয়ে গেলাম বিপ্লবী যা আমার ধাতে সইবার নয়।"*[৪১] বিপ্লবের উত্তাল মুহূর্তে নিজের বিপ্লবীসত্তা নিয়ে অনুরূপা বিশ্বাসের এই দ্বান্দ্বিকতা থেকেও অনুমিত হয় কোথাও যেন নারীর প্রথাগত জীবনের বিরোধিতা থেকে তিনিও গণবিপ্লবের পথে এগিয়ে ছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, দেশের জাতীয় আন্দোলন নারীর প্রথাগত জীবন ধারায় মুক্তির সন্ধান দিলেও নারী কি সেই মুক্তি পেয়েছিল। ছবি বসু অনুরূপা বিশ্বাসদের উত্তরসূরি সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন (১৯০৯-১৯৮১) আত্মজীবনীতে লিখেছেন রাস্তায় নেমে বয়কট-পিকেটিং আন্দোলনে যোগ দিতে না পেরে তাঁর অস্থিরতার কথা। লিখেছিলেন, শুধু ঘরে বসে চরকা কেটে মন ভরে না: *"শুধু এইটুকুতে যেন তৃপ্তি হয় না। আরও করবার জন্য প্রাণটা উসখুস করে। কিন্তু কেন আমরা পারি না? আমাদের কথা কেউ শোনে না, শুধু আবোধের প্রাচীরে মাথা কুটে মরবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি না কি? ফ্রান্সের চাষার মেয়ে জোয়ান আর্ক যা যা করেছিল আমরা ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে তা পারি না কেন?"*[৪২] অনুরূপা বিশ্বাস পার্টির নিদের্শে আত্মগোপন করে আক্ষেপের সঙ্গে শুনিয়েছেন— *"আত্মগোপন করে আক্ষেপের সঙ্গে শুনিয়েছেন— "আত্মগোপন করে আছি, একে কি অবাধ জীবন বলে? এটা কি মুক্তি হতে পারে? অথচ আগে ভেবেছি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেই আর কোন বাঁধা থাকবে না।"*[৪৩] আর ছবি বসুর স্বামী বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা সুনীল কুমার

বসু ১৯৪৯ সালে জেলবন্দী হবার পর দীর্ঘদিন যখন বক্সা জেলে বন্দি ছিলেন, ছবি বসু চেয়েছিলেন কলকাতা থেকে বক্সা গিয়ে স্বামীর সাথে দেখা করতে, সেই মত ছবি বসু স্বামীর কাছে চিঠিও পাঠিয়েছিলেন তার মত চেয়ে, কিন্তু সেই চিঠির জবাব আসে নি। লেখিকার অন্তরে জেগেছে– *"আশ্চর্য আমার এই প্রস্তাবটির কোন জবাবই এলো না। 'অবলা নারী' আখ্যাটি কি মনে ছিল, নয়ত আর কিসের আশঙ্কা ছিল?"* [৪৪] রাজনৈতিক কর্মী জীবনের মাঝে জেলবন্দি স্বামীর দ্বারা এইভাবে প্রত্যাখ্যান একদিকে সমাজ মানসিকতায় নারীর অবহেলিত পরিসরেরই কথা বলে।

কোলকাতায় এসে কিশোরী ছবি বসু কমলা দাসগুপ্তের মত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে দেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি উৎসাহিত হয়েছিলেন। পাশাপাশি দেখা যায় পড়াশুনোকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। এক জায়গায় লিখেছেন– *"ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ার সময়, গরেমে বা সুজোর ছুটিতে সুকুমারীর সঙ্গে আমার নিয়মিত পত্রালাপ চলত। ও কী কী বই পড়ছে। আমিই বা কী পড়ছি, জানতে চাইত।"*[৪৫] আরেক জায়গায় লিখেছেন এ সময় বিদেশ ফেরত দাদার কাছে বইয়ের তালিকা করে, গোগোল, ল্যারম্যান্টভ, মোপাসাঁ, চেকভ, টলস্টয়, গোর্কি, পুশঁকিন ইত্যাদি ধ্রুপদী সাহিত্যিকের বই পড়ার কথা।[৪৬] ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে পাশ করার পর ছবি বসু ইতিহাসে অনার্স নিয়ে কলকাতার আশুতোষ কলেজের মহিলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন আশুতোষ কলেজের উঁচু ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শনের ঘটনার কথা। ছবি বসুর কথায়– *"প্রথম দেখা শান্তিনিকেতন, বিশেষ করে কবির মুখোমুখি হওয়া যে কত সৌভাগ্যের, তা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। এটি সত্যি একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। ... সুরমাদি মৃদুকণ্ঠে কথা বলছেন। উনি জবাব দিচ্ছেন। শান্তিনিকেতন নামটি উল্লেখে তাঁর সচকিত মুখ চোখ। চোখে তখন গ্লানির আভাস*

নয়, পরম সুখের প্রকাশ। তাঁর পরম সাধনার ধন 'আমাদের শান্তিনিকেতন।' ... শুধু কবি নন, গোটা আশ্রমবাসীই সেদিন আমার মন টেনে ছিল। মেয়েদের কী সাবলীল সপ্রতিভ চেহারা, শহুরে কৃত্রিমতা কোথাও তাদের চেহারায় ছাপ পেলেনি। শ্রীনিকেতনের হালকা রঙের শাড়িতে, তাদের কাঁদা অঙ্গের লাবনি, উজ্জ্বল প্রাণখোলা হাসি, বড়ই শ্রীময়ি করে তুলেছে। চারিদিকে বুঝি কালিদাসের কালের শকুন্তলা, অনসূয়া আর প্রিয়ম্বদার পদধ্বনি। আমি কান পেতে সেই পদধ্বনি শুনি।''[৪৭] জীবনের ছোট ছোট ঘটনাবৃত্তিগুলিও মানুষের জীবনে গভীরতম প্রভাব বিস্তার করে। সে দিনের শান্তি নিকেতনের যে রূপকল্প লেখিকা এঁকেছেন তাতে তিনি নিজেরও মনোবৃত্তির পরিচয় দান করেছেন। আবার দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ বাঙালির কাছে - বাঙালি নারীর কাছে আদর্শের প্রতীক হিসাবেই বিরাজ করেছেন, তা অবশ্য আজো বাঙালি তথা গোটা বিশ্বের কাছেই রবীন্দ্রনাথ আদর্শের প্রতীক হিসাবেই বিরাজ করছেন। লেখিকা বলেছেন, শান্তিনিকেতনে যাবার পূর্বে শুনেছিলেন ওখানে মেয়েদের খুবই সাধারণ সাজসজ্জা সেইমত আশুতোষ কলেজের মেয়েদের পরনে ছিল মায়ের কস্তাপেড়ে অতি সাধারণ সাদা শাড়ি। উদীচী বাড়ির সামনে হেলান দেওয়া চেয়ারে বসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, মৃদুকণ্ঠে কথা বলছিলেন ছাত্রীদলের নেতা, কলেজের অধ্যপিকা সুরমা দাশগুপ্তার সঙ্গে। প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, 'নবীনাদের প্রবীণা সাজা আমি পছন্দ করিনে।''*[৪৮] এইরূপ ঘটনার উল্লেখে রবীন্দ্রনাথ কেও নতুন করে চিনে নেওয়া যায় ছবি বসুর আত্মকথায়।

ছবি বসু যখন আশুতোষ কলেজে পড়ছিলেন তার পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে লন্ডনে বোমা পড়ার দরুন এই সময় ছবি বসুর দাদা দেশে ফিরে আসেন। ১৯৪১ সালের শেষাশেষি কোলকাতা শহরেও যে বিশ্বযুদ্ধে ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল, ছবি বসু আত্মজীবনীতে স্মরণ করছেন সে সব দিনের কথা। লেখিকার কথায়– *"তখন ১৯৪১ সালের*

শেষাশেষি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জোর কদমে চলছে। সারা কলকাতা মার্কিন সৈন্যে বরে গেছে। সত হোক, মিথে হোক গুজবের শেষ নেই। চৌরঙ্গ এলাকা থেকে শহরের গলি-ঘুঁজি-বস্তি অঞ্চলে তারা মেয়ে মানুষের খোঁজে ঘুরছে।''[৪৯] সে সময় মার্কিন সৈনিকের ভয়েই যে ছবি বসু ও তার দিদি রেডিওতে নাটক করা ছেড়ে দিয়েছিলেন আত্মজীবনীতে তা বলেছেন। ছবি বসু আরও জানিয়েছেন সে সময় জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতার অনেকগুলি স্কুল কলেজ কলকাতা থেকে বাইরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ মানুষও সে সময় কলকাতা ছাড়তে শুরু করেছিল। *''বিশেষ করে মেয়ে ও শিশুদের ইভ্যাকুয়েশনের হিড়িক পড়ে যায়।''*[৫০] ছবি বসুও পরিবারের সঙ্গে পাড়ি জমান বাবার কর্মস্থল উড়িষ্যার নেটিভ স্টেট আটগড়ে। বিশ্বযুদ্ধের কারণেই ছবি বসুকে তাঁর বি.এ. পরীক্ষা সেন্টার বদল করে তৎকালীন পাবনায় দিতে হয়েছিল। জীবনের কথা বলতে গিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ঘটনাবৃত্তিগুলির স্মৃতিচারণ থেকে ইতিহাসকে নতুন করেই খুঁজে পাওয়া যায়।

১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যবর্তী পর্যায়ের বেশ কিছুটা সময় ছবি বসু তাঁর পিতার কর্মস্থল উড়িষ্যার আটগর, সোনাপুর অঞ্চলে কাটিয়ে ছিলেন। এর পূর্বে অসুস্থতার কারণে তিনি বি.এ. পরীক্ষায় অনার্স বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পারেন নি পাস কোর্সের পরীক্ষাগুলি দিয়েছিলেন। বি.এ. পরীক্ষা তিনি পাস কার্সে ডিসটিংশন নিয়ে উত্তার্ণ হয়েছিলেন। ছবি বসুর উড়িষ্যায় থাকাকালীনই শুরু হয়েছিল ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় (কুইট ইন্ডিয়া) আন্দোলন। ছবি বসুর স্মৃতি চারণায় ধরা পড়েছে এই আন্দোলনের চিত্র– *''উড়িষ্যাতেও 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে', এই শপথবাক্যটি লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। বেঙ্কানল, আটগড়ের পাশে করদ রাজ্যটিতে আন্দোলন এবং সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় ছড়িয়ে পড়ে। রেললাইন, ব্রিজ, অনেক জায়গাতেই উপড়ে ফেলা হয়, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন অহিংসনীতির বেড়াজাল ভেঙে ফেলে।''*[৫১] ছবি বসু আরও জানিয়েছেন এই সময় উড়িষ্যার

বিখ্যাত নেতা বৈষ্ণব পট্টনায়ক কে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ মরিয়া হয়ে ছুটছিলেন। '৪২'-এর আন্দোলনের সময়ই যে কটক থেকে প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র *'সমাজ'* এর সম্পাদক রাধাকান্ত রথ কে পুলিশ গ্রেফতার করে *'সমাজ'* কাগজটিকে বেআইনী ঘোষণা করেছিল, ছবি বসু আত্মজীবনীতে তা উল্লেখ করেছেন। উড়িষ্যার পাশাপাশি বাংলাতেও ছড়িয়েছিল '৪২'-এর ভারত ছাড় আন্দোলনটি। '৪২'-এর ভারত ছাড় আন্দোলনে শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মদানের কথা ছবি বসু স্মরণ করেছেন। লেখিকার কথায়– *"বাংলার মেদিনীপুর জুড়েই তখন আন্দোলন। যে মহিলাটি সমস্ত বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে আদর্শ স্থানীয়া, তিনি কৃষক মহিলা মাতঙ্গিনী হাজরা। তিয়াত্তর বছরের এই বৃদ্ধ সেই অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে কংগ্রেসের কাজে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। মেদিনীপুরে সবাই তাঁকে 'গান্ধীবুড়ি' আখ্যা দিয়েছিল। একটি মিছিল তিনি সেদিন পরিচালনা করেছিলেন, সেদিন তাঁর হাতের বজ্রমুষ্টিতে ধরা ছিল জাতীয় পতাকা, কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। নিজের রক্ত উৎসর্গ করে পতাকার সম্মান অক্ষুন্ন রেখেছিলেন এই বৃদ্ধা শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা।"*[৫২] ছবি বসু পরবর্তীকালে যখন 'বাংলার নারী আন্দোলন' (১৯৪৮) বইটি লিখেছিলেন সেখানেও দেশের জাতীয় আন্দোলনে মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকার কথা লিখেছিলেন।। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালের দেশের জাতীয় আন্দোলনের চালচিত্রগুলি তুলে ধরার কারণে ছবি বসুর আত্মকথা এই কালপর্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটির অনুসন্ধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠে পরিণত হয়েছে।

১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের উত্তাপটি যেতে না যেতেই ১৯৪৫ সালে সমগ্র দেশেই খাদ্য-বস্ত্র-নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অনটন শুরু হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকটাতে ছবি বসু উড়িষ্যাতে বাবার কর্মস্থলে ছিলেন সেখানে ছবি বসুর পরিবারেও যে কাপড়ের সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল ছবি বসু উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি '৪৩' সালের দুর্যোগের দিনে উড়িষ্যার গ্রামীণ অঞ্চলের চিত্রও উঠে এসেছে তাঁর লেখায় – *"১৯৪৩-এর মন্বন্তরের দিনের*

কথা লিখছি। কিন্তু উড়িষ্যায় তখন চাল অফুরন্ত। অথচ মানুষের হাতে ক্ষমতা সেই সস্তার দিনেও চাল কেনার। বেঙ্গানল, নয়াগড়, কালাহান্ডি সর্বত্র হা-অন্ন-বা-অন্ন অবস্থা। কালাহাণ্ডি মানুষখেকো বাঘের কথা অনেকে শুনেছি। কিন্তু সাধারণ মানুষকে যে অন্নের পরিবর্তে গাছের পাতা খেয়ে মরতে হচ্ছিল, সে খবরও নিত্য কানে আসে।''[৫৩] উড়িষ্যার গ্রামীণ অঞ্চলে শ্রেণী বৈষ্যমের চিত্র দেখে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন– ''কী নিদারুণ দারিদ্র উড়িষ্যায় মানুষের, আমার সেই কম বয়সেই তা লক্ষ্য করেছি। তখনও শ্রেণী বৈষ্যম্যের কথা এত জানতাম না তবু কেন একদিকে অঢেল সম্পদ, আর একদিকে ক্ষুধার রাজ্য, এই আকাশপাতাল বিভেদটা বড় দুঃখ দিত। তখন ভাবতাম সব কিছুর জন্যই তো বিদেশীরাজ দায়ী। তাই এদের হটালেই বুঝি রামরাজ্য আসবে।''[৫৪]

স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে দেশের সংকটের জন্য তরুণী ছবি বসুর বিদেশী সরকারকে দায়ী করা কিংবা বিদেশী সরকারের অপসারণে দেশে 'রামরাজ্য' আগমণের কল্পনা দেশের বৃহত্তর জনমানসের মনোভাবের কথাই বলে যায়। তবে দেশের মানুষের এই ভুল ভাঙতে বেশি সময় লাগেনি। তেভাগা আন্দোলন সমকালেই দেশের মানুষ বুঝেছিলেন দেশের সংকটের জন্য লড়াইটা দেশের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধেও করতে হবে।

১৯৪৩ সালের শেষের দিকে ছবি বসু ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। *'৪৩'* সালের মন্বন্তরে বাংলাতেও চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছিল। ছবি বসুর জবানিতে সেই দুর্যোগের দিনের চিত্র এভাবে ধরা পড়েছে– ''১৯৪৩ সাল (পঞ্চাশের মন্বান্তর)। সারা বাংলার চরম দুর্যেগের দিন। রাজনৈতিক আন্দোলন শেষে হতে না হতে লোভী মানুষ সরকারী সাহায্যের সৃষ্টি করে এক মর্মান্তিক মন্বান্তর।

গ্রাম বাংলার কালোবাজারীরা ধান-চাল গুদামজাত করে ক্রমান্বয়ে তা কালোবাজারে পাচার করে। আর বুভুক্ষ মানুষ, অসহায় মানুষ, শহরের পথে

পথে, গৃহস্থের দরজায় আকুল আহ্বান করে, 'ভাত চাইনে মা, শুধু এটুখানি ফ্যান্স। ফ্যান। কাতরকণ্ঠে ছেলে, বুড়োবুড়ি, শিশুর আর্তনাদ।"[৫৫] একজন সংবেদনশীল ব্যক্তি হিসাবে ছবি বসু সমকালীন সময়কে যে অতি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এই চিত্রগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে। কলকাতায় ফিরে এসে ছবি বসু মানুষের সংকটকে কেবল দূর থেকে দেখলেন না। অপরিচয় থাকলেও এ সময় তিনি উত্তর কলকাতায় যুব কংগ্রেসীদের দ্বারা পরিচালিত দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রে যোগদান করেছিলেন।[৫৬] এটাই ছিল তরুণী ছবি বসুর অভ্যস্ত জীবনের গণ্ডি পেরবার প্রথম পদক্ষেপ। সমকালীন সময়ে তাঁর মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া এইরূপ স্বীকৃতি বাক্যে– *"আমরা ভাই ও বোন, অসীম ও আমি সঙ্কল্প করছি এই অভ্যস্ত জীবনধারা আর নয়। পৃথিবীতে শুধু দর্শকের আসনে বসে থাকলে চলবে না। যুগধর্মী নতুন চিন্তানায়কের মতো জোর কদমে চলতে হবে।''* [৫৭] জীবনের এই পর্বের কথা লিখতে গিয়ে ছবি বসু একজায়গায় স্মরণ করেছেন ভাই অসীম ও তাঁর প্রেসিডেন্সি কলেজের বন্ধু নাজিমুদ্দিন হাশেম আর শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা ধারা নিয়ে আড্ডার চিত্র। লেখিকার কথায় – *"অসীম আমার ছোট ভাই। ... এই সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের দুই ছাত্র নাজিমুদ্দিন হাশেম আর শহীদুল্লা কায়সার। এদের সঙ্গে আমি। এই চারজন মিলে তখন স্ট্যালিন গ্রাদের রেড আর্মি যুদ্ধে হিটলার নয় রেড গার্ড,* [৫৮] *কে কতদূর এগোচ্ছে আর মার খাচ্ছে এই নিয়ে তুমুল আলোচনা।*

অসীম আর হাশেম ইংরেজি সাহিত্যের সেরা ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এরাই প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান নেয়। আর শহীদুল্লা অর্থনীতির এক নামকরা ছাত্র। বেশ মনে পড়ে আমাদের বাড়িতে সূর্যাস্তের শেষ আলো পড়েছে চাদের এক কোণে, সেখানে আমাদের কতদিন কত রঙিন জল্পনাকল্পনা। স্তালিনগ্রাদে রাশিয়ার বিজয় শুনে আমরা একথালা মুড়ি আর চানাচুর ফরমাস করে ফেলি।

হঠাৎ শহীদুল্লা বলে, 'আপা, তুই একটা যা তা। সেদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে

বাহিড়ী যা একখানা বক্তৃতা দিল। তুই তো যাস নি। যা তা নয়ত কী। কী যুক্তি, কী উত্তাপ। একেবারে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।'

এই হচ্ছে শহীদুল্লা কায়সার। ছোট্টখাট্ট মানুষটি। টিকটিকে রোগা, মুখে যেন তুবড়ি ফুটছে।

বলে, 'বাবা তো হজ করতে যাচ্ছেন। ভাবছেন ছেলেও তাঁরই মতো ধর্মে মতি হবে।' বলতে বলতে লাফিয়ে কাঁপিয়ে এক পাক ঘুরে নিল। দেশবিভাগের পর ওদের আর কোন খবর রাখিনি। আমার জীবনধারাও কত পরিবর্তনের মুখে।'[৫৯]

বোন, ছোট ভাই ও তার কলেজ পড়ুয়া বন্ধুদের নিয়ে সাম্যের আদর্শে উদ্বেলিত এই যে বৃত্ত, তারুণ্যের উচ্ছলতা ও তাগের আদর্শে প্রাণিত হয়ে বিশ্ব জয়ের সাধনায় মেতে ওঠা, সেই আবহ খানখান হয়ে পড়েছিল উপমহাদেশের রাজনীতির সংঘাত-দ্বন্দ্ব-হানাহানিতে। প্রেসিডেন্সি কলেজে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ কিংবা মফঃস্বলী পটভূমি থেকে আগত মুসলিম ছাত্রদের এমনি সম্পৃক্তি চল্লিশের দশকে বিশেষ প্রসারতা অর্জন করেছিল, কিন্তু সেই ধারা বিকাশের স্বাভাবিক পথ বেয়ে এগোতে পারে নি এবং পঞ্চাশের দশকে তা প্রায় বিলুপ্তির দশা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী জীবনে শাহীদুল্লা কায়সার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তি যুদ্ধে সামিল হয়ে জেলবন্দী হয়েছিলেন। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের রাজসাহী জেল থেকে লেখিকাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি। লেখিকা উল্লেখ করেছেন চিঠির প্রসঙ্গটি। লেখিকার কথায়– *"ভূপেন বোস এ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে বহুদিন বাদে পাকিস্তান থেকে আঁটা খামে পরপর শহীদের দুটি চিঠি পেলাম।*

রাজসাহী জেলের সেন্সরবন্দী চিঠি। কালো ধ্যাবড়া আঁচড়ে চিঠি প্রায় পড়াই যায় না এইটুকু কোন মতে পড়েছি, 'আপা, আমার জন্য ভাবিসনে। বেঁচে আছি তোর ভাই অসীম (খোকন) কি এখন প্রাইমারী টিচার্স ফ্রন্টে রয়েছে? আহারে, তোর বাবা! কোথায় ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট ছেলে বিলেতে গিয়ে আই.সি,

এস হবে, তা নয় কমিউনিস্ট পার্টি? তুই নিশ্চয়ই আমাকে অনেক বই, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা পাঠাবি। কতটা পাব জানিনে। তবে জানিস আমাদের মানসিকভাবে সুস্থ রাখবার চাবিকাড়ি তোদের হাতে। তোরাই তো এইবাবে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবি। কীরে হাসছিস? জানি তোর হাসিতে যে কত কান্না লুকিয়ে তাকে। কবে আবার আমাদের দেখা হবে, আপা? ভাল থাকিস।'

কিছু কিছু এখানকার বইপত্র শহীদুল্লাকে পাঠাই, জানিনে পৌঁছুল কিনা। কিন্তু সত্যি পেয়েছে। কী আনন্দ হল কী বলব! খুশীতে গান গেয়ে উঠি। তারপর আবার দীর্ঘ নীরবতা।

আবার চিঠি আসে, 'কত কিছুই যে জানতে চাই। তুইও তো জানতে চাস। এমন একটা খোঁয়াড়ে আছি যেখানে আকাশ দেখা যায় না। এক মুঠো আলো ও আসেনা।' সব কিছু তারপর কালির আঁচড়ে ঢাকা।'[৬০] এই যে সব কিছু ঢেকে গেল কালির আঁচড়ে তা উভয় বাংলার হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্তের মিলিত জীবনসাধনার সকল সম্ভাবনা লন্ডভন্ড করে দিল। ইতিহাসের ছুরি এক জাতিগোষ্ঠীর দুই সম্প্রদায়কে এমনিভাবে পৃথক করে ফেললো, এতোটাই পৃথক যে কেউ কারো নাগাল আর পাচ্ছে না।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে যুব কংগ্রেসীদের রিলিফকার্যে যুক্ত হওয়ার পর থেকে ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত ছবি বসু যুব কংগ্রেসীদের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসীদের সব কথা মেনে নিতে পারেন না আবার কমিউনিস্ট পার্টিরও কিছু কিছু মন্তব্যতে আপত্তি থাকে। তিনি লেখেন, *"যুব কংগ্রেসীদের ঘরোয়া মিটিং-এ যাই। তবে মন থেকে ওদের কথা কথা মেনে নিতে পারি না। খালি কুৎসা আর কুৎসা। কমিউনিস্টরা দেশদ্রোহী, সেই একঘেঁয়ে নিন্দা।"*[৬১] আরও লেখেন, *"গোটা ১৯৪৫-১৯৪৬ সাল কংগ্রেসীদের সঙ্গে যুক্ত রইলেও আমি একটা মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটাই। কমিউনিস্টদের মতো আমি নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে পঞ্চম বাহিনী, কুইসলিঙ বলা ভাবতেই পারিনি, যেমন দেশদ্রোহী হিসাবে*

কমিউনিস্টদেরও মানতে পারিনি। সুভাষচন্দ্র যখন দেশপ্রিয় পার্কে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন, আমি তাঁর খুব কাছেই ছিলাম। সুদর্শন এ সুবক্তা এই মানুষটির উদাও কণ্ঠস্বরে স্বাধীনতার *আহ্বান, সমস্ত জনতার মতো আমারও মনকে উদ্বেল করে তুলেছিল। তাঁকে নেতার আসনে না বসালেও একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক বলে মনে মনে শ্রদ্ধা করেছি।'* [৬২]

সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে পার্টির মতামতকে মেনে নিতে পারেন নি মণিকুন্তলা সেনও। তাঁর 'সেদিনের কথা'-য় তিনি তা ব্যক্ত করেছেন,– *"ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র গোপন পথে জার্মানিতে চলে গেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওখান থেকে সাহায্য নিয়ে ভারতীয় বাহিনী গড়ে তুলে ইংরেজের বার্মা ঘাঁটি ভেঙে ভারতে প্রবেশ এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করা। ভারত তো প্রস্তুত ছিলই।*

সবচেয়ে মুশকিলে পড়লাম আমরা। অন্তত আমি। পার্টি লাইনের পুরো আলোচনা-সমালোচনা করতে আমি সক্ষম নই কিন্তু নিজের মনের মধ্যে এ লাইন আমি সর্বতোভাবে সঠিক মনে গ্রহণ করতে পারিনি। সুভাষ চন্দ্রের জার্মানি যাওয়া এবং পরে ১৯৪২ সনে জাপান যাওয়া আমরা বিরূপ চোখে দেখলাম। ১৯৪২ সনে পার্টির নতুন লাইন বেরুল। ওদিকে ভারতে জাপানি আক্রমণ শুরু হল। 'জনযুদ্ধ' কাগজে সুভাষকে কুইসলিং বলা হল ও কার্টুন বের হল। এরফলে জনতার কাছ থেকে আমরা উপহার পেলাম ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও ধিক্কার। সুভাষচন্দ্র তখন বাংলার জনমানসে যে কত বড়ো শ্রদ্ধার আসনে বসেছিলেন সেটা বোধ হয় আমাদের জানা ছিলনা। নয়তো সুভাষচন্দ্র কী করছেন জানবার আগেই আমরা তাকে কী অপমানই না করলাম এবং দেশের মানুষকে কী আঘাতই না দিলাম।' [৬৩] আসলে সুভাষ বসুর জাপান বা জার্মানির সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে হঠানোর চিন্তা ঠি কি বেঠিক এই নিয়ে পার্টির একটা সঠিক ব্যাখ্যা এবং তা 'র‍্যাংক অ্যাণ্ড ফাইল'-এর কাছে নিয়ে যাওয়া পার্টি কোনদিনই করেনি।

সুভাষ বসুর প্রসঙ্গ বাদ দিলে কমিউনিস্ট পার্টিই তখন ছবি বসুকে আকর্ষণ

করেছিল। তবে দৃঢ় নিশ্চয়তার অভাব ছিল। এদিকে কংগ্রেসের ভারত ছাড় আন্দোলনকে সফল করার জন্য ছবি বসু কাজ করে যাচ্ছেন; জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অরুণা আসফ আলি, সুচেতা কৃপালানী, মিনু মাসানি প্রমুখ নেতৃত্বের ভাষণ খুঁটিয়ে পড়ছেন তবু যেন ওই দলকে নিজের মনে হয়নি। লিখেছেন– ''নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হত, এই দোটানার জীবনযাপন বড়ই কষ্টকর।''[৬৪] আবার এই সময় বাড়িতে দাদার কাছে কমিউনিস্ট নেতারা আসলেও তাদের রদ্ধদ্বার বৈঠকে কখনো ডাক পাননি। নিজের বিশ্বাস নিয়ে পার্টিতে যোগদান করেছিলেন ১৯৪৬-এর '*ডাক-তার*' ধর্মঘটের পরে। পার্টিতে আসার উৎসাহ পেয়েছিলেন বিমল চৌধুরীর মত পার্টির প্রতি সমর্পিত প্রাণ ব্যক্তিত্বকে দেখে যাকে তিনি দেখে ছিলেন– ১৯৪৬ এর '*ডাক-তার*' ধর্মঘটে লাল ঝাণ্ডা হাতে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যেতে।

পার্টিতে আসার পর থেকেই ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রিটে যাতায়াত শুরু করে ছিলেন দায়িত্ব পান '*সোমেন চন্দ লাইব্রেরী*'[৬৫] দেখা শোনার। ছবি বসু জানিয়েছেন, সমসাময়িক প্রগতিবাদী অনেক বই ও সাময়িকীর সাথে এখানেই তিনি প্রথম পড়েন *'টাইমস লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট'*। ৪৬নং, ধর্মতলা স্ট্রীটের 'সোমেন চন্দ্র লাইব্রেরী'টি পরিচালনা করতে গিয়ে সমকালীন রীজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সংস্পর্শেও এসেছিলেন ছবি বসু। যুক্ত হয়েছিলেন 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ '-এ।[৬৬] সেদিনের ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের ঐতিহ্যের পরিচয় পাই তাঁর আত্মকথায়। এক জায়গায় লিখেছেন– *"একটি হল ঘর, আড়াউখানা খুদে কামরা আর একটু করো ছাত, ৪৬ নং ধর্মতলায় এখানে যেন এক নতুন জগৎ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নীরেন রায় স্বর্ণ কমল মিত্র, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সোছনবীশ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, স্নেহাংশু আচার্য, সুচিত্রা মিত্র, সল্লিল চৌধুরী, বিনয় রায়, বিজন ভট্টাচার্য সবাই মিলে ফ্যাসিবিরোধী মৈত্রী সঙ্ঘ গড়ে তোলেন সাহিত্য, শিল্প,*

সঙ্গীত নিয়ে। সেই উত্তাল জোয়ারের গভীরতা এখনকার প্রজন্মের কাছে অকল্পনীয়। ৪৬নং-এ তখন নানা দেশের কমিউনিস্টরা আসতেন। শুধু ব্রিটেন, আমেরিকা থেকেই নয়, আসতেন আফ্রিকান, গ্রীক, জাপানি, এমনকি ইহুদি শিল্পীও। এঁরা কেউ কবি, কেউ শিল্পী। বুদ্ধিজীবী যেমন রয়েছেন, তেমনি আবার রয়েছেন ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, সেই সঙ্গে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষও। এঁদের সবাইকে একসূত্রে বেঁধেছিল সাম্যবাদ।"[৬৭] ৪০-এর দশকে ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটকে কেন্দ্র করে যে মানবীয় সাধনার এক উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল, সেই ইতিহাসকেই পুনঃর্জীবিত করেছেন ছবি বসু স্মৃতি চারণে। তবে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সেই স্বর্ণযুগে যে উদার ও সার্বজনীন আবহ প্রভাবশালী ছিল তা বেশিদিন কার্যকর থাকে নি। 'গণনাট্য সঙ্ঘ' (আই.পি.টি.এ) কিংবা 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ-এর সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের নায়কত্ব ও কৃতিত্ব কমিউনিস্ট পার্টি দাবি করে, কিন্তু সেই উদার সংস্কৃতিক আবহ পরবর্তী সময়ে তাদের দ্বারা বিশেষ গ্রাহ্য হয়নি। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে বি.টি. রণদিভের নেতৃত্বে বিভিন্ন হঠকারী সিদ্ধান্তে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাকে বহু কমরেডের জীবন তছনছ করে দিয়ে তাঁদের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকাই দুরূহ করে তুলেছিল।

৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটে 'সোমেন চন্দ্র লাইব্রেরী'টি পরিচালনার সূত্রেই লেখিকার পরিচয় ঘটেছিল উমা সোহানবীশ এর সঙ্গে। উমা সোহানবীশ এর কাছে সে সময় তিনি জানিয়েছিলেন পার্টি নিয়ে তাঁর উৎসাহের কথা। উমা সোহানবীশ লেখিকাকে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'তে যোগ দানের কথা বলেন, পার্টিনেত্রী মণিকুন্তলা সেনের কাছেও নিয়ে যান। লেখিকা জানান– *"মণিদি যেন আমার সমস্ত মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে আমাকে দু' হাত দিয়ে কাছে টেনে নিলেন।"*[৬৮] চল্লিশের দশকে বামপন্থী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েদের এইরূপ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চিত্র কিন্তু ইতিপূর্বে সেভাবে চোখে পড়েনি। গান্ধীজির আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালি মেয়েরা এগিয়ে এসেছিল।

মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী দলেও বাঙালি মেয়েদের অংশ গ্রহণ ঘটেছিল। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রথম মহিলা শহীদের তকমাও পেয়েছিলেন। নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজে পৃথক নারীবাহিনী গঠিত হয়। কিন্তু পৃথকভাবে বাঙালি মেয়েদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস অমিলই থেকে গেছে। এ'দিক থেকে চল্লিশের দশকের বামপন্থী আন্দোলন বিশেষ কৃতিত্বে দাবি রাখে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে যোগদানের পর ছবি বসু বালিগঞ্জের মনোহর পুকুর, পণ্ডিতিয়া বস্তী অঞ্চলে আত্মরক্ষা সমিতি পরিচালিত স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। তাঁর আত্মকথায় সেদিনের আত্মরক্ষা সমিতির মেয়েদের কর্মযোগের বিস্তৃত পরিচয় আছে। লিখেছেন পার্টি কর্মী সান্ত্বনা মাসীর কথা। একদিন পার্টির বই বিক্রির সূত্রে সান্ত্বনা মাসীর বাড়ি পৌঁছে স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত সান্ত্বনা মাসীর পরিচয় পেয়েছিলেন লেখিকা। আত্মসমালোচনা করে লেখেন– *"কোন সূত্র থেকে তিনি পার্টিদরদী হয়ে গেছেন সে কথাও কোন দিন জিজ্ঞাসা করিনি। যেমন কোনদিন খবরও রাখিনি তাঁর জীবন যন্ত্রণার কথা।*

থেকে থেকে মনে হতো, বিশেষ করে সন্দেহ হতো, মানুষকে সত্যিই কি আমরা জানি? বা চিনি? আমাদের তো শুধু বাঁধাধরা স্লোগান সর্বস্ব কথা। ... আমরা সাম্যের কথা বলতাম। সমাজ পরিবর্তনের কথা তো অবশ্যই বলতাম। দেশ স্বাধীন হলেই মেয়ে পুরুষের, ধনী-দরিদ্র্যের বৈষম্য দূর হবে। এক স্বর্গরাজ্যের পরিকল্পনা প্রায়... কিন্তু আমাদের পাশেই উপস্থিত মানুষটি চিরকালের দুঃখী, নির্যাতিতা বাঙালী রমণী, একটা কোনদিনই জানা ছিলনা। তবে শাশুড়ি বা ননদের দ্বারা তিনি লাঞ্ছিত নন। স্বামীর সংসারে তিনি নিত্য লাঞ্ছনা ভোগ করছেন।"[৬৯] এইরকম অনুভবের কথা নারীদের কলম থেকেই বেরিয়ে আসে। লেখিকা সান্ত্বনা মাসীর পরিচয় দিতে আরও লেখেন– *"এর পরেই একদিন। হয়তো বা নির্দিষ্ট মূল্যে চালের দাবী নিয়ে মিছিলে চলেছি আইন সভার দিকে। ঘুমন্ত ছেলেটাকে কোলে নিয়ে রোজকার মতোই সান্ত্বনা মাসী সারিবদ্ধ হয়ে চলেছেন। উদ্ভাসিত*

তাঁর মুখে পড়ন্ত বেলার আলো। চোখে কেমন এক মায়াময় দৃষ্টি। কী ভাবছেন, কিসের স্বপ্ন দেখছেন সান্ত্বনা মাসী? কেমন করে সমস্ত যন্ত্রনা, আপমানকে তিনি জয় করে চলেছেন? কোথায় খুঁজে পেলেন এত অপার আনন্দ?"[৭০] জীবনযন্ত্রণা ভুলে মিছিলে সামিল হওয়া সান্ত্বনা মাসী চল্লিশের দশকে বামপন্থী আন্দোলন ঘিরে সাধারণের উন্মাদনারই যেন একটা রূপ।

নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে ১৯৪৮ সালে বিটি পরীক্ষা দিলেন ছবি বসু। 'বাংলার নারী আন্দোলন' বিষয়ে তাঁর পথিকৃৎ বইটিও তখন বের হয়েছে। পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বিলেত থেকে এডুকেশনে এম.এ. করার অফার পেয়েছিলেন। খুলে বলেন নি, কিন্তু পার্টির কাজের দায়িত্বের ভাবনা থেকে সেই সুযোগ গ্রহণের কথা মোটেই ভাবেন নি। সেই বছরে ডিসেম্বরে তাঁর বিয়ে হয় কোলকাতার বনেদী পরিবারের ছেলে পার্টি কর্মী সুনীল কুমার বসুর সঙ্গে। যিনি কাটু বসু নামেই অধিক পরিচিত। পার্টির প্রকাশনা সংস্থা ন্যাশনাল বুক এজেন্সির সঙ্গে সুনীল কুমার বসু যুক্ত ছিলেন। পাত্র ছবি বসুর নিজের পছন্দ করা ছিল। আত্মজীবনীতে এই বিয়ের উদ্যোগ সম্পর্কে ছবি বসু খুব কমই বলেছেন। তবে তাঁর 'সান্নিধ্যের ভুবন' বই-এ অসীম রায় অধ্যায়ে জানিয়েছেন বিয়ের ব্যাপারে ভাই অসীম রায় তাঁর হয়ে বাবা মাকে বুঝিয়েছিলেন। লেখিকার কথায়– *"আমার বাবা মায়ের কাছে আমার আসু বিয়ের কথাটাও অসীমের মারফতই জানাতে হয়েছিল। তখন পার্টি বেআইনী, চারদিকে নৃত্য ধরপাকড়, কতদিন বাইরে থাকা যাবে সেটা অনিশ্চিত। একদিকে অগ্রহায়ণ মাস শেষ হতে চলেছে। পৌষ মাসে বিয়ে হবে না। সাত দিনের মধ্যে বিয়ে না হলে বিয়েটাই অনিশ্চিত হয়ে যাবে। অসীমই বাবা-মাকে সব বুঝিয়ে বলে অবশ্য পাত্রের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে যত কম বলা যায় তাই সে বলেছিল। বাবা-মার স্বপক্ষে অবশ্য যুক্তি ছিল মাত্র সাত দিনে মেয়ের বিয়ে, সেটা ম্যানেজ করা গেল।"*[৭১] অনাড়ম্বর ভাবে কোনরকম লৌকিকতা-তত্ত্বতালাস ছাড়া বিয়ে করেছিলেন। ছবি বসু এই কারণে

শ্বশুরবাড়ির মেয়ে মহলে সমালোচিত হন তিনি। জানিয়েছেন– *"আমি রাজনৈতিক মেয়ে। রায়বাহাদুরের মেয়ে হলেও, এ বাড়ির নিরিখে আমার পরিবার বড়লোক নয়। কোনরকম লৌকিককতা ও তত্ত্বতালাস আমার বিয়েতে হবে না– এটা বাবা মাকে বুঝিয়েছি। পিঁড়িতে চড়ে সাতপাক ঘুরবনা– হেঁটে হেঁটে ঘুরা। ... কিন্তু এ নিয়ে কি আর শ্বশুরবাড়িতে মেয়ে মহল ছেড়ে দেবেন? বিয়ের পর শ্যাম বাজারের বাড়ি গেলে মেয়ে মহলে যে ধরনের আলোচনা হতো তাতে মনে হতো, আমাকে উদ্দেশ্য করে ওদের বলবার অনেক কিছু রয়েছে।*

যেমন ফুলশয্যার তত্ত্ব, দোলের তত্ত্ব, ইলিশ মাছের তত্ত্ব, আরও কত তত্ত্ব কোন বৌয়ের বাপের বাড়ি থেকে থেকে এসেছে– আর সারা উঠোনে থই থই করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।"[৭২] সমাজে মেয়েদের জীবন যাপনের গতানুগতিক ধারা ছবি বসুর মত মেয়েরা অস্বীকার করে বেরিয়ে আসতে পারলেও সমাজে মেয়েদের একটা বৃহত্তর অংশ যে সেই গতানুগতিকতাকে আকড়ে ধরে ছিল এই ঘটনা যেন তারই সাক্ষ্য রাখে। শ্বশুর বাড়িতে নিজের যোগ্যতার সঠিত মূল্যায়ণ না পেয়ে কখনো তিনি আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছেন– *"ভাল বৌয়ের মাপকাঠি কী? বিয়ের আগেই আমার বাঙলার নারী আন্দোলন বইটি বেরিয়েছে। .... শ্যামাবাজারের বাড়ির কারও মুখেই এ নিয়ে কোন প্রশ্ন কৌতুহল কোনদিনই শুনিনি। লোকের কাছে বরং মেয়েদের বলতে শুনিনি। লোকের কাছে বরং মেয়েদের বলতে শুনেছি, 'বাঙাল দেশের মেয়ে ইনি। সাক্ষাৎ দ্রৌপদী যেন। রাধেন কী খাসা...'*

মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিই। সেই চিরকালীন নারী আমি। আমার গর্বিত হবার কোন কিছুই বিন্দুমাত্র নেই।"[৭৩] লেখিকার প্রতিবাদী এই স্বর বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সমাজে নারী-পুরুষের সহাবস্থানের বৈপরীত্যকেই প্রদর্শন করে।

১৯৪৯ সালে বিয়ের চার মাসের মধ্যে গ্রেফতার হলেন স্বামী । প্রেসিডেন্সি

জেল, দমদম জেল হয়ে নীত হলেন ভুটান সীমান্তের বক্সা জেলে। সদ্য বিবাহিত স্বামী জেলে, পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, পার্টি নেতৃত্ব দেখছেন রাতারাতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধার অলীক স্বপ্ন, জেলা কমিটির সম্পাদক ঘোষণা করেছেন কাকদ্বীপ থেকে গোটা দক্ষিণ বাংলা এখন মুক্তাঞ্চল, সামনে সমাজবাদী বিপ্লব, কমরেডরা শ্রেণী সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করুণ। আর শ্রেণী সংগ্রমের পদাতিক বাহিনীর একজন ছবি বসু দাঁত কামড়ে নেমেছেন সেই চেষ্টায়, থাকছেন পালিয়ে পালিয়ে, ডালহৌসি স্কোয়ার বম্ব কেসের আসামী হিসেবে ক'দিন হাজতবাসও করে এসেছেন। বামপন্থার উগ্রতা তখন শিল্প-সংস্কৃতির জগতেও আঘাত হেনেছে, রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করে নতুন প্রলেতারীয় সাহিত্যের বন্দনায় মুখরিত হচ্ছেন নেতৃত্ব, প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেনা কেউ। সব কিছুই বলেছেন ছবি বসু, উচ্চকিত অভিযোগ ছাড়াই, লিখেছেন, *"সময়টা ১৯৪৯-১৯৫০ সাল রণদিভে পিরিয়ড নামে পরিচিত সময়, বাম সঙ্কীর্ণতার যুগ।"*[৭৪]

ঘটনার বিচ্ছিন্ন বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখিকা তুলে ধরেছেন বাস্তব কিছু ছবি, আর সমাজ বিশ্লেষকরা এর মধ্যে খুঁজে পাবেন আরও অনেক বড় সত্য। এই যে হঠকারিতাকে চিহ্নিত করা হল *'রণদিভে পিরিয়ড'* হিসেবে তাতে সমষ্টিগত দায়কে চাপানো হয় ব্যক্তির উগ্রতার ওপর। অপরদিকে প্রাগ থেকে প্রকাশিত সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক মুখপত্র *'For a Lasting for people's Democrracy'*-তে প্রকাশিত এক নিবন্ধের কল্যাণে ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি প্রত্যাহার করে নেয় উগ্রতার নীতি। সেটাও ভারতীয় কমিউনিস্টদের জন্য কোনো কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে না। ছবি বসু অবশ্য এইসব রাজনৈতিক বিবেচনায় অগ্রসর হন নি, তিনি বলেছেন মাঠ পর্যায়ের সংকটের কথা, লিখেছেন– *"রণদিভে পিরিয়ডকে এই হঠকারী নীতি আমরাও মনেপ্রানে সমর্থন করতাম। না করে উপায় কি? আমরা তো নগন্য ক্যাডার। নিজস্ব চিন্তাভাবনা তো থাকার কথা নয়।"*[৭৫] হঠকারিতা যখন হামলে পড়েছিল

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালি সংস্কৃতির সুকৃতির ওপর সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন– *"রবীন্দ্রনাথের চরিত্র হননের চেষ্টা দিনের পর দিন বেরুচ্ছে। তখনও তার প্রতিবাদ হয়নি। মনে মনে হয়ত গুমরেছেন কেউ কেউ। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস বামপন্থী মহলে হয়নি। কখন যে কে 'ধনতন্ত্রের দালাল' আখ্যা পাবে, নিশ্চয়ই তা আশঙ্কার একমাত্র কারণ ছিল।"*[৭৬] তবে এই হঠকারী নীতির জন্য বিপুল মূল্য দিতে হয়েছিল। সাধারণ কমরেডদের, তাঁদের অনেকের পরিচয় রয়েছে ছবি বসুর স্মৃতিভাষ্যে এবং তাঁদের সম্পর্কে তিনি গভীর বেদনা নিয়ে লিখেন, *"এই ভুল পথে কত মানুষের জীবনই তো শেষ হয়ে গেছে। বহু কমরেডই তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। অনেকের মনোবল ভেঙে যায়।"*[৭৭] বিস্তারিত খুলে বলেননি তিনি, কিন্তু বুঝতে পারা যায় এই পর্বের পর আগের সেই উদ্যম নিয়ে দলের কাজে আর সম্পৃক্ত হতে পারেন নি ছবি বসু।

ছবি বসু তাঁর আত্মকথায় ব্যক্তি জীবনের কথা খুব কমই তুলে ধরেছেন। বিয়ের চার মাসের মধ্যে স্বামী সুনীল কুমার বসুকে জেলে যেতে হয়। প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেল তারপর দমদম ও বক্সা জেলে স্থানান্তরিত হন সুনীল কুমার বসু। ১৯৫০-৫২ মধ্যবর্তী সময়ে নিজেদের মধ্যে যে সমস্ত চিঠি বিনিময় হয়েছিল তার সামান্য কিছুর উল্লেখ আছে আত্মজীবনীতে। এই চিঠিগুলিতে দেখা যায় জেল নিবাসী স্বামী, স্ত্রীর কাছে একের পর এক বইয়ের লিস্ট পাঠাচ্ছেন আর লেখিকা তার উত্তরে লিখছেন কোন বই পেয়েছেন বা পাননি তার কথা। এ যেন বই এর মধ্যে দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর হৃদয় সংযুক্তির প্রচেষ্টা। প্রেম-ভালোবাসার উল্লেখ নেই একেবারেই। তবে সুন্দরবনের দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে ভ্রমণ করে এসে লেখিকা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জেল নিবাসী স্বামীকে জানিয়েছিলেন,–

"সুন্দরবনের গাঁয়ে ঘুরে এসে কাটুকে লম্বা চিঠি লিখলাম– 'তোমাকে অনেক গল্প শোনাবার সাধ হচ্ছে। ফটিক সর্দার, শ্রীনাথের ঠাকুমা, সহচরী, হারাণী, ফুলমনি, গিরিবালা, সূর্যমণি, আরও কত জনার। ওদের দেখে গর্বে বুক ভরে

উঠেছে অসংখ্য বীর ও বীর কন্যারা যে এদেশের মাটিতেই জন্মেছে ও জন্মাচ্ছে তাদের শুধু আমার চোখে নয়, তোমাকেও যে দেখাতে ইচ্ছে করছে।'

উত্তরে চিঠি আসে– 'তুমি কত সুন্দর সুন্দর মানুষের খবর দিয়ে চিঠি লিখেছ। আমরা দুর্ভাগ্য তাদের নামগুলো কালো কালিতে এক্কেবারে লেপাছেপাঁছা। মন খারাপ করো না। একদিন না একদিন ছাড়া পেয়েই যাব। তখন দুজনের চার চোখে কত যে দেখব, তা কি বলার শেষ আছে।'[৭৮] চিঠির এই উল্লেখে এটা অন্তত বোঝা যায় জেল নিবাসী সুনীল কুমার বসু স্ত্রীর রাজনৈতিক কার্যকলাপে উৎসাহিত ছিলেন। তবে সুনীল কুমার বসুর স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে স্ববিরোধিতার দিকটিও লক্ষিত হয়। বক্সাজেলে থাকাকালীন লেখিকা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠি পাঠালে কিন্তু সুনীল কুমার বসু স্ত্রীকে চিঠির উত্তর পাঠান নি। এই ঘটনায় লেখিকার মনে হয়েছিল– *"অবলা নারী' আখ্যাটি কি মনে ছিল, নয়ত আর কিসের আশঙ্খা ছিল?'*[৭৯]

রাজনৈতিক কর্মী ছবি বসুর প্রেমাকুল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় যখন আত্মজীবনীর ১২ নং অধ্যায়ে রণদিভে পিরিয়ডের সমাপ্তি কথা জানানোর পাশাপাশি সে সময় নিজের জীবনের প্রসঙ্গে লেখেন,–

"অনেক দিন পর ভূপেন বোস রোডের সেই ফ্ল্যাটটির তালা খুলি। কোন দিন যে আবার এখানে ফিরে আসব, আবার ঘরদোর গুছোব, কারও প্রতিক্ষায় থাকব, এত ভাবিনি। তবু এ ঘরটি হাতছানি দিয়েছে–

ছোট ঘরখানি মনে কি পড়ে সুরঙ্গমা
মনে কি পড়ে,
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিন রাত হাওয়ার ঝড়ে।
সাগর দোলা

সারা দিন রাত জানালা খোলা
দিগন্ত থেকে দিগন্তরে
সাগর ভরে ঢেউয়ের দোলা। ...
সেই খরখানি
মনে কি পড়ে?

Hilaire Belloc– *এর লেখা, অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু’’*[৮০]

জেলবাসী স্বামী সুনীল কুমার বসু বাড়ি ফিরে আসলে জীবনের কথা জানাতে লেখিকা লেখেন–

“আমি এখন অতীতচারী। আমার বেশ লাগে নিঃসঙ্গ দিনগুলিতে, এক এক সময় সেই ফেলে আসা এক একটি দিনের স্মৃতিতে সাঁতার কাটতে। কতদিন পর বিশ্রাম পেয়েছি দুজনায়, এক টুকরো শান্তি।

আমি সত্যিই এই ঘরোয়া নীড়টির জন্য কাঙাল হয়ে উঠেছিলাম। জীবনে কি প্রেম ভালবাসা স্বপ্নের কোন দাবী নেই? ব্যক্তিগত জীবনটা কি হিসেব নিকেশ মেনে চলবে! কতটা সমাজ আর কতটা দেশকে দিলাম! যৌবনের অনেকটা সময় তো ইতিহাসকে দু’হাত ভরে দিলাম। কিন্তু জীবনের একটি দাবী রয়েছে।’’[৮১]

লেখিকার জীবনের এইরূপ অভিব্যক্তি আত্মজীবনীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। আসলে ছবি বসুর আত্মজীবনী রাজনৈতিক গতিধারার এক বিস্তৃত আলেখ্য হলেও এটা কোন রাজনৈতিক ইতিহাসের শুষ্ক বই নয় এর এক জীবন্ত নায়ক আছে, যে নায়ক ছবি বসু নিজেই।

আত্মজীবনীতে লেখিকা যৌবনের প্রথম পর্বের ঘটনাবৃত্তকে যতটা পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে সাজিয়েছেন পরবর্তী জীবনের ঘটনা সেভাবে আসেনি, অনেকটাই ছাড়া ছাড়াভাবে এই পর্বটির কথা বলে গেছেন তিনি। ১৯৫০ সালে মহিলা ফ্রন্ট

ছেড়ে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন লেখক ফ্রন্টে। এই সময়কাল থেকে নিজের লেখালেখির প্রতি তিনি মনোনিবেশ করতে শুরু করেছিলেন। যা এর পূর্বে রাজনৈতিক জীবনের ব্যস্ততার সূত্রে হয়ে ওঠেনি। লেখক ফ্রন্ট ঘিরে সেদিনের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলটির পরিচয় তিনি দিয়েছেন। ১৯৫২ সালে সুনীল কুমার বসু জেল থেকে ফিরে আসলে অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে তাঁকে যে অনেকটা উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হয়েছিল আত্মজীবনীতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের এই পর্বের কথা জানাতে নিজের রাজনৈতিক সক্রিয়তার কথা তিনি বলেন নি তবে ৬০-এর দশকের গোড়ায় দক্ষিণ কোলকাতার মেয়েদের সঙ্গে তিনি যে *'সুদক্ষিণা সমবায় সমিতি'* প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, আত্মজীবনীতে তা জানিয়েছেন।[৮২]

ষাটের দশকে রাজনৈতিকভাবে ততটা সক্রিয় না থাকলেও ১৯৬৩ সালের পার্টির বিভাজনে যে চরম আঘাত পেয়েছিলেন তার কথা লেখিকা জানান। পার্টির বিভাজনের শূন্যতাকে তুলনা করেছেন স্বামীর মৃত্যুর পর জীবনের শূন্যতার সঙ্গে। স্বামীর মৃত্যুর স্মৃতি চারনা করতে করতে লিখেছেন– *"যে অপরিমেয় আঘাত, যে শূন্যতাবোধ অনুভব করি, তার সঙ্গে তুলনীয় না হলেও এর আগে ১৯৬৩-তে কমিউনিস্ট পার্টি যখন দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল (C.P.I. C.P.I. (M) তখন একপ্রকার শূন্যতা ও হতাশায় গেছিলাম।"*[৮৩]

মনিকুন্তলা সেনও 'সে দিনের কথা' বইতে পার্টির বিভাজন হওয়ার পর লেখেন– *"পার্টি ভাগ আমার কাছে দেশ ভাগের মতোই বেদনাদায়ক।"*[৮৪] পার্টির বিভাজনে ছবি বসু কিংবা মনিকুন্তলা সেন-এর অভিব্যক্তির এইরূপ বহিঃপ্রকাশ পার্টির সঙ্গে তাঁদের গভীর সংপৃক্ততার কথা বলে। কিন্তু এর পেছনে কোথাও যেন মনে হয় তাঁদের নারী পরিচয়টি জড়িত। ছবি বসুর আত্মজীবনী আলোচনা করতে গিয়ে মনে হয়েছে সমাজ বদলের উৎসাহ থাকলেও নারীর গতানুগতিক জীবনধারা থেকে বেরিয়ে আসাও পার্টির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়ানোর একটি কারণ

হিসাবে কাজ করেছে। তাই হয়তো সামাজিক অবরোধের বেড়াজাল থেকে জীবনের মুক্তির প্রেরণাস্থল হিসাবে 'পার্টি'-র বিভাজন ছবি বসুর মত মেয়ের কাছে কিংবা মনিকুন্তলা সেন এর মত মেয়ের কাছে এতটা বেদনাদায়ক মনে হয়েছে।

সত্তরের উত্তাল সময়ও তাঁকে আলোড়িত করেছিল। সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। ভীষণভাবে কষ্ট পান তিনি। নিজের উৎকণ্ঠার কথা জানাতে লিখেছেন– *"এক অদ্ভূত আঁধারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। রাত্তিরে ও ঘুম চলে যায়। ষোল-সতেরো বছরের ছেলেটা কি পাশের গরে ঘুমোচ্ছে? হয়ত ঘুমোচ্ছে, কিন্তু স্বপ্নে যে দেখি কারা ওকে ছুরি মারছে। চারদিকে শুধু রক্ত, পাইপগান নিয়ে কারা ছুটে গেল। রাতভর এই স্বপ্ন দেখি। বুক ধড়খড় করে।"*[৮৫] সত্তরের দশকের উত্তাল সময়ে লেখিকার মত আরও অনেক মা-ই হয়তো এভাবেই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল।

১৯৮৪ সালে স্বামীর মৃত্যুতে জীবনে একটা বড় আঘাত পেয়েছিলেন। জীবনের বেশ কিছু সময় কাটিয়ে ছিলেন বিদেশে ছেলে মেয়ের কাছে। বিদেশে কাটানো সময়ের কথা বলতে গিয়ে এক একটি দেশের শিল্প-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানা চিত্তাকর্ষক বিবরণ উল্লেখ আছে আত্মকথায়। ছবি বসুকে আমরা দেশ বিদেশের সাহিত্য চর্চা করতেও দেখি। মনট্রিয়ালে থাকাকালীন একজন প্রবাসী ভারতীয় মহিলার কাছে *'Selected Reading list for cross cultural Women's Literature Sources'*[৮৬] বইটি পেয়ে নানা দেশের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে জেনেছিলেন, একথা লেখিকা আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন। পাশাপাশি লেখালেখির কাজটিও করে গেছেন। একাধিক অনুবাদ কর্ম এ সময় তার হাত থেকে বেরিয়ে এসেছিল তার পরিচয় আত্মজীবনীতে নিজেই দিয়েছেন। ১৯৯৮ সালে দেশে ফিরে আসেন। জীবনের বাকি পর্বটা দেশেই কাটিয়ে ছিলেন। নিজের একাকিত্ব দূর করতে পড়াশুনা লেখালেখির

ওপর নির্ভর করেছেন। লিখেছেন–

"এই একলা নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র বই পড়ে এবং কিছু লিখে নিজেকে আমি আনন্দ দিই। সেটাই বা কম কী? এই বিশাল বিশ্বজুড়ে আনন্দের কত বিচিত্র প্রকাশ রয়েছে। আমি কেনই বা তা থেকে একটি একটি করে ফুল চয়ণ করে নেব না। হয়ত যৌবনকালের মতো স্বাদে, গন্ধে তেমন অফুরন্ত আনন্দের সম্ভার নেই।''[৮৭]

মুক্ত চিন্তার অধিকারী ছবি বসু জীবনের যে উত্তরণ দেখেছেন তা হয়তো নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষেরই প্রণিধানযোগ্য। শেষ জীবনে অনেকের চাপাচাপিতেই আত্মজীবনী লিখতে বসেছিলেন। আর আত্মজীবনী লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন–

"তবে প্রশ্ন জাগছে কার জন্য লিখছি? সহজ জবাব আগামীদিনের মানুষের জন্য।''[৮৮]

লেখিকার এই বিশেষ সচেতনতা বিশ শতকের এক বাঙালি নারীর মানসিক উত্তরণেরই কথা বলে। তাঁর আত্মজীবনী কেবল সমাজ ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক থেকেই পাঠ্য নয়। দীর্ঘ জীবনপথ অতিক্রম করে আসা এক দার্শনিককে যেন আমরা পেয়ে যাই এখানে। জীবনীর শেষটা দার্শনিকের মতই উচ্চারণ করেছেন–

"কমলাকান্ত যৌবন হারিয়ে দুঃখ জানিয়েছেন। উনি যাই বলুন না কেন, আমি বলি যৌবনের মৃত্যু নেই। আমি অবশ্য মনের যৌবনের কথাই বলতে চাই। খোকামি যেমন সাইতে পারি না, তেমনি বুড়োমিও আমার সয়না। একাকীত্বে ক্ষনে ক্ষণে ভুগলেও, স্মৃতি হাতড়ালে আনন্দ তো দূরের নয়।

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিন রজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।।

পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া–
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি–
নিত্য পূর্ণ ধারা জীবনে কিরণে।।
বসিয়া আছ কেন আপন মনে,
স্বার্থ নিমগন কী কারণে?
চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লাহো শূন্য জীবনে।।

গীত বিতান, পর্যায় পূজা, ৩২৬ সংখ্যক গান, পৃ: ১৩৭'[৮৯]

বঙ্কিম সাহিত্য, রবীন্দ্র সাহিত্যের যুগলবন্দিতে মুক্ত চিন্তার আলোকবর্তিকা আত্মজীবনীকার ছবি বসু জীবনের জয়গান গেয়ে ভবিষ্যতের পথিককেই যেন পথ দেখাতে চান। আর এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা।

তথ্যসূত্র

১। ছবি বসু, ফিরে দেখা, স্ত্রী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ: লেখিকার কথা অংশ।

২। প্রাগুক্ত, পৃ: মুখবন্ধ অংশ।

৩। ঐ, পৃ: ৪১।

৪। ঐ, পৃ: ৪১।

৫। ঐ, পৃ: ৪১-৪২।

৬। ঐ, পৃ: ৪২।

৭। ঐ, পৃ: ৯৭-১০২।

৮। ঐ, পৃ: ১।

৯। ঐ, পৃ: ১।

১০। ঐ, পৃ: ৩।

১১। ঐ, পৃ: ১২ ।

১২। ঐ, পৃ: ১৬।

১৩। ঐ, পৃ: ২।

১৪। ঐ, পৃ: ৪।

১৫। ঐ, পৃ: ৪।

১৬। ঐ, পৃ: ৫।

১৭। ঐ, পৃ: ৪।

১৮। ঐ, পৃ: ৮।

১৯। ঐ, পৃ: ১২।

২০। ঐ, পৃ: ৮।

২১। ঐ, পৃ: ৬।

২২। লীলা মজুমদার, পাকদণ্ডী, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ: ২০৯

২৩। ছবি বসু, প্রাগুক্ত, পৃ:১৩।

২৪। ঐ, পৃ: ১৪-১৫।

২৫। ঐ, পৃ: ১৫।

২৬। ঐ, পৃ: ১৪।

২৭। ঐ, পৃ: ২০।

২৮। ঐ, পৃ: ২০।

২৯। ঐ, পৃ: ২০।

৩০। ঐ, পৃ: ১৬।

৩১। ঐ, পৃ: ১৬।

৩২। ঐ, পৃ: ৭।

৩৩। ঐ, পৃ: ১৯।

৩৪। ঐ, পৃ: ১৯।

৩৫। ঐ, পৃ: ২৭।

৩৬। ঐ, পৃ: ৩০।

৩৭। ঐ, পৃ: ৩০।

৩৮। ঐ, পৃ: ৩১।

৩৯। ঐ, পৃ: ৩১।

৪০। ঐ, পৃ: ৩১।

৪১। অনুরূপা বিশ্বাস, নানা রঙের দিন (প্রথম খণ্ড), বরাকনন্দিনী প্রকাশনী, শিলচর, ২০০৬, পৃ: ১০৫

৪২। ঈশিতা চক্রবর্তী, 'অন্দর থেকে বাহির, বাহির থেকে অন্দর : আত্মকথনে বাঙালি মেয়েরা (১৮০৯-১৯৩৪)', নারীবিশ্ব, পুলকেশ, মণ্ডল সম্পাদনা, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮, পৃ:৩৩৫।

৪৩। অনুরূপা বিশ্বাস, নানা রঙের দিন (প্রথম খণ্ড), বরাকনন্দিনী প্রকাশনী, শিলচর, ২০০৬, পৃ: ৮৯।

৪৪। ছবি বসু, প্রাগুক্ত, পৃ:১১৩।

৪৫। ঐ, ১পৃ: ৩২।

৪৬। ঐ, পৃ: ৩২।

৪৭। ঐ, পৃ: ৩৩।

৪৮। ঐ, পৃ: ৩৩-৩৪।

৪৯। ঐ, পৃ: ৩৪।

৫০। ঐ, পৃ: ৩৪।

৫১। ঐ, পৃ: ৩৯।

৫২। ঐ, পৃ: ৪০।

৫৩। ঐ, পৃ: ৩৮।

৫৪। ঐ, পৃ: ৩৯।

৫৫। ঐ, পৃ: ৪০।

৫৬। ঐ, পৃ: ৪০।

৫৭। ঐ, পৃ: ৭৪।

৫৮। আসলে হবে রেড আর্মি। রেড গার্ড তো অনেক পরের চীনা 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' কিশোর বাহিনী।

৫৯। ছবি বসু, ফিরে দেখা, স্ত্রী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ:৭৫।

৬০। ঐ, পৃ: ৭৫।

৬১। ঐ, পৃ: ৪০।

৬২। ঐ, পৃ: ৪১।

৬৩। মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, 'মণিকুন্তলা সেন জনজাগরণে নারী জাগরণে' জন্ম শতবার্ষিক রচনা সংগ্রহ, থীমা, কলকাতা, ২০১০, পৃ:৬০।

৬৪। ছবি বসু, প্রগুক্ত, পৃ:৪১।

৬৫। ঐ, পৃ: ৪৩।

৬৬। ঐ, পৃ: ৪৩।

৬৭। ঐ, পৃ: ৪৪।

৬৮। ঐ, পৃ: ৪৫।

৬৯। ঐ, পৃ: ৪৭।

৭০। ঐ, পৃ: ৪৮।

৭১। ছবি বসু, সান্নিধ্যের ভুবন এবং মুশয়েরা, কলকাতা ২০১১, পৃ: ৮৮-৮৯।

৭২। ছবি বসু, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০।

৭৩। ঐ, পৃ: ৭১।

৭৪। ঐ, পৃ: ৭৯।

৭৫। ঐ, পৃ: ৯১।

৭৬। ঐ, পৃ: ৮০।

৭৭। ঐ, পৃ: ১০৮।

৭৮। ঐ, পৃ: ৯৬।

৭৯। ঐ, পৃ: ১০৩।

৮০। ঐ, পৃ: ১০৮।

৮১। ঐ, পৃ: ১১৬।

৮২। ঐ, পৃ: ১২০।

৮৩। ঐ, পৃ: ১৪৫।

৮৪। কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অকথিত ইতিহাস', নৈঃশব্দ ভেঙে আত্মকথনে ভারতীয় নারী, সম্পাদনা ঈশিতা চক্রবর্তী ও অন্যান্য, স্ত্রী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ: ২৪৪।

৮৫। ছবি বসু, প্রগুক্ত, পৃ: ১২৪।

৮৬। ঐ, পৃ: ১৫০।

৮৭। ঐ, পৃ: ১৫৭।

৮৮। ঐ, পৃ: ১৫৬।

৮৯। ঐ, পৃ: ১৫৮।

অনুরূপা বিশ্বাস

(১৯৩২-২০১২)